নিজের যাবতীয় ধ্যান-ধারণা ও কামনা-বাসনাকে বিসর্জন দিয়ে দেবে। এরই সার-সংক্ষেপ হল সত্যনিষ্ঠা।

এই সত্যনিষ্ঠাই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মতের মর্যাদা অন্য সমস্ত উম্মত অপেক্ষা অধিক হওয়ার রহস্য এবং তাদের বৈশিষ্ট্য। যারা সত্যিকারভাবে উম্মতে মুহাম্মদী তারা নিজের সমগ্র জীবনকে ন্যায়ের অনুগামী করে দেয়। যে দল বা পার্টি'র নেতৃত্ব দেয় তাও একান্ত নির্ভেজাল ন্যায় ও সত্যের ভিত্তিতেই দিয়ে থাকে। নিজের ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ বা কামনা-বাসনা এবং বংশগত কিংবা জাতীয় আচার আচরণের কোন প্রভাব তাতে থাকতে দেয় না। আর পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদের ক্ষেত্রেও সব সময় ন্যায়ের সামনে মস্তক অবনত করে দেয়। কাজেই সাহাবায়ে কিরাম (রা) ও তাবেঈন (রা)-এর সমগ্র ইতিহাস এই চরিত্রেরই বিকাশ।

পক্ষান্তরে যখনই এ উম্মতের উল্লিখিত দুটি চরিত্রে কোন রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটেছে, তখন থেকেই শুরু হয়েছে অবনতি ও বিপর্যয়।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আজ এই সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠ উম্মতই নির্ভেজাল রিপুর পূজারীতে পরিণত হয়ে গেছে। তাদের কোন দল বা জামাত গঠিত হলে তা একান্ত আত্মস্বার্থ এবং নিকৃষ্ট ও তুচ্ছ পার্থিব লাভালাভের ভিত্তিতেই গঠিত হয়। একে অপরকে যে সমস্ত বিষয়ে নিয়মানুবর্তিতার আমন্ত্রণ জানায়, তাও রৈপিক কামনা-বাসনা অথবা বংশীয় আচার প্রথার ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। কিন্তু সত্য ও শরীয়তের অনুগমনের জন্য কোথাও কোন সংগঠন হয়ও না, কেউ এ ব্যাপারে চলার জন্য আমন্ত্রণও জানায় না। এমনকি শরীয়ত ও সত্যের বিরুদ্ধাচরণ দেখে কারো মনে সামান্য ভাবান্তরও হয় না।

এমনিভাবে পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ এবং বিবদমান মামলা-মুকদ্দমার ক্ষেত্রে সামান্য কয়েক দিনের কাল্পনিক মোহের খাতিরে আল্লাহ্‌র কানুনকে পরিহার করে পৈশাচিক আইন ও নীতিমালার মাধ্যমে বিচার মীমাংসায় রাযী হয়ে যায়।

এরই দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি পরিলক্ষিত হচ্ছে স্থানে স্থানে, দেশে দেশে। সবখানেই এই উম্মতকে দেখা যায় লাঞ্ছিত, পদদলিত। তারা আল্লাহ্ থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে —আর সেজন্যই আল্লাহও তাদের সাহায্য-সহায়তা থেকে ফিরে গেছেন।

ন্যায় ও সত্যনিষ্ঠার পরিবর্তে রিপুর তাড়নায় তাড়িত হয়েও কোন কোন লোক যে পার্থিব লাভ হাসিল করতে পেরেছে, প্রকৃতপক্ষে তা হলো তার উপর এক মগ্নতার আবরণ। কিন্তু এ যে গোটা জাতি ও সম্প্রদায়ের জন্য নিশ্চিত ধ্বংসেরই পরিণতি, সেদিকে লক্ষ্য করার কেউ নেই। সমগ্র জাতির কল্যাণ যদি কাম্য হয়, তাহলে এই কোরআনী নীতিমালাকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। নিজেকেও সে অনুযায়ী আমল করতে হবে এবং অপরকেও আমল করাতে ও তার নিয়ামানুবর্তী হতে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করতে হবে।

দ্বিতীয় আয়াতে এই সন্দেহের উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, জাতীয় উন্নতি যখন সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠ এবং ন্যায়বিচারের অনুসরণের উপর নির্ভরশীল, তখন অন্যান্য অমুসলিম জাতি-সম্প্রদায়, যারা সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠা থেকে সম্পূর্ণভাবে দূরে সরে রয়েছে, তাদেরকে কেন পৃথিবীতে উন্নত ও বিকশিত দেখা যায়? তার উত্তর হচ্ছে এই ঃ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ আমার আয়াতসমূহকে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আমি স্বীয় হিকমত ও রহমতের ভিত্তিতে তাদেরকে সহসাই পাকড়াও করি না। বরং ধীরে ধীরে, ক্রমান্বয়ে পাকড়াও করি যা তারা টেরও পায় না। সুতরাং এ পার্থিব জীবনে কাফির ও পাপিষ্ঠদের সচ্ছলতা এবং মান-মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করে ধোঁকায় পড়া উচিত নয়। কারণ, তাদের জন্য সেটি কোন কল্যাণকর বিষয় নয়, বরং এটা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের জন্য اِسْتِدْرَاج (অবকাশ দান)। আর ইস্‌তিদরাজ অর্থ হলো পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে কোন কাজ করা। কোরআন ও সুন্নাহ্‌র পরিভাষায় ইস্‌তিদরাজ বলা হয় বন্দীর পাপাচার সত্ত্বেও দুনিয়াতে তার উপর কোন বিপদাপদ আরোপিত না হওয়া—বরং যতই সে পাপ করতে থাকবে পার্থিব ধন-সম্পদেরও বৃদ্ধি ততই ঘটবে। যার পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, তার অসৎ কর্মের ব্যাপারে সে কখনও সতর্ক হতে পারে না এবং গাফলতির চোখও খোলে না, নিজের অপকর্ম তার কাছে মন্দ বলেই ধরা পড়ে না, ফলে সে তা থেকে বিরত হওয়ার কথাও ভাবতে পারে না।

মানুষের এ অবস্থার উদাহরণ সেই চিকিৎসাহীন রোগীর মত যে রোগকেই আরোগ্য এবং বিষকেই প্রতিষেধক মনে করে ব্যবহার করতে শুরু করে। ফলে কখনও দুনিয়াতেই সহসা কোন আযাবে ধরা পড়ে আবার কখনও মৃত্যু পর্যন্ত এই ধারা চলতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যুই তার নেশাগ্রস্ততা ও অজ্ঞানতার অবসান করে দেয়। আর চিরন্তন আযাবেই হয় তার ঠিকানা।

কোরআন করীম বিভিন্ন সূরা ও আয়াতে এই পর্যায়ক্রমিকতার আলোচনা করেছে। বলা হয়েছে ঃ فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى اِذَا فَرِحُوْا بِمَا اُوْتُوْا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ —অর্থাৎ তারা যখন সে বিষয় বিস্মৃত হয়ে বসেছে, যা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তখন আমি তাদের জন্য সব ব্যাপারে দরজা খুলে দিয়েছি। এমনকি তারা তাদের প্রাপ্ত ধন-দৌলতের কারণে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছে।

আর আমি তাদেরকে হঠাৎ আযাবের মাধ্যমে পাকড়াও করেছি। আর তখন তারা অব্যাহতি লাভের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছে।

এই যে 'ইসতিদরাজ' এটা কাফিরদের সাথেও ঘটে থাকে এবং পাপী মুসলমানের সাথেও। সে কারণেই সাহাবায়ে কিরাম (রা) এবং পূর্ববর্তী মহাত্মা মনীষীদের যখনই কোন পার্থিব নিয়ামত বা ধন-দৌলত আল্লাহ্ তা'আলা দান করতেন, তখন তাঁরা ভীতি বিহবলতার দরুন ইস্তিদরাজের ভয় করতেন যে, পার্থিব এই দৌলতই না আবার আমাদের জন্য ইস্তিদরাজের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

তৃতীয় আয়াতে এই ইস্তিদরাজ তথা পর্যায়ক্রমিক অবকাশ দানের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ঃ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ অর্থাৎ আমি গোনাহগারদের অবকাশ দিতে থাকি। আমার ব্যবস্থা বড়ই কঠিন।

চতুর্থ আয়াতে রয়েছে, কাফিরদের সেই অর্থহীন ধারণা-কল্পনার খণ্ডন যে (নাউযু বিল্লাহ) মহানবী (সা) মস্তিষ্ক বিকৃতিতে ভুগছেন। বলা হয়েছে ঃ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ —অর্থাৎ তারা কি চিন্তা-ভাবনা করে দেখে না যে, যার সাথে তাদের পালা পড়েছে তাঁর সামান্যতমও মস্তিষ্ক বিকৃতি নেই। তাঁর বুদ্ধি-বিবেচনার সামনে তো সমগ্র পৃথিবীর বুদ্ধিজীবীর চিন্তাশীলতা পর্যন্ত অবাক ও বিস্মিত। তাঁর সম্পর্কে মস্তিষ্ক বিকৃতির ধারণা করা তো নিজেরই মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ। মহানবী (সা) তো পরিষ্কার ও প্রকৃষ্ট তথ্যসমূহ বর্ণনা করে থাকেন এবং আখিরাতে আল্লাহ্ তা'আলার কঠিন আযাব সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করেন।

পঞ্চম আয়াতে এই দু'টি বিষয় সম্পর্কে মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা করার আহবান জানানো হয়েছে। প্রথমত আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট আসমান, যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী অসংখ্য বিস্ময়কর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করা। দ্বিতীয়ত নিজের জীবনকাল আর কর্মাবকাশের প্রতি লক্ষ্য রাখা।

আল্লাহ্র অসংখ্য সৃষ্টি সম্পর্কে সামান্য মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা করলে একজন স্থূলবুদ্ধি মানুষও আল্লাহ্ তা'আলার মহা কুদরতের পরিচয় ও দর্শন লাভে সমর্থ হতে পারে। আর যারা কিছুটা সূক্ষ্ম ও গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন তারা তো বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুকে মহা শক্তিশালী ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের তস্বীহ ও প্রশংসা-কীর্তনে নিয়োজিত দেখতে পায়। যে দর্শনের পর আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঈমান আনা এবং বিশ্বাস স্থাপন করা একটি অতি স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়ে যায়।

আর নিজের জীবনকালে চিন্তা-ভাবনা করার ফল হয় এই যে, যখন মানুষ একথা উপলব্ধি করতে পারে যে, মৃত্যুর সময়টি যখন নির্দিষ্ট করে জানা নেই,

তখন সে প্রয়োজনীয় কাজ-কর্ম সমাধা করার ব্যাপারে যে কোন শৈথিল্য থেকে বিরত হয়ে যায় এবং একান্ত একাগ্রতার সাথে কাজ করতে আরম্ভ করে। মৃত্যুর ব্যাপারে গাফলতিই মানুষকে বাজে কাজ আর অপরাধপ্রবণতায় প্রবৃত্ত করে। পক্ষান্তরে মৃত্যুকে সর্বক্ষণ উপস্থিত জ্ঞান করাই এমন এক বিষয়, যা মানুষকে যাবতীয় অপরাধ-প্রবণতা থেকে বেঁচে থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। সে জন্যই মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتُ অর্থাৎ "তোমরা এমন বিষয় সম্পর্কে বেশি পরিমাণে স্মরণ কর, যা সমস্ত ভোগ-বিলাস স্পৃহাকে নিঃশেষ করে দেয়। আর তা হল মৃত্যু।"

কাজেই উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে— أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مَلَكُوتٍ—قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ শব্দটি রাজ্য অর্থে ব্যাপকতা বোঝানোর জন্য বলা হয়ে থাকে। তার অর্থ সেই মহাবিশ্ব সম্পর্কে কি তারা চিন্তা-ভাবনা করেছে, যা সমগ্র আকাশ ও পৃথিবী এবং অসংখ্য বস্তু-সামগ্রীকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। আর তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, 'হয়তো মৃত্যু অতি নিকটেই রয়েছে, যা এসে যাবার পর ঈমান বা আমলের অবকাশ শেষ হয়ে যাবে।'

আয়াত শেষে বলা হয়েছে ঃ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ— অর্থাৎ যারা কোরআনে হাকীমে এহেন প্রকৃষ্ট নিদর্শন সত্ত্বেও ঈমান আনে না, তারা আর কোন্ বিষয়ের প্রেক্ষিতে ঈমান আনবে?

مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ۖ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ
يَعْمَهُونَ ۝ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۖ قُلْ
إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ۖ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۗ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۗ
قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

(১৮৬) আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। আর আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের দুষ্টামীতে মত্ত অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে রাখেন। (১৮৭) আপনাকে জিজ্ঞেস করে, কিয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে? বলে দিন—এর খবর তো আমার পালনকর্তার কাছেই রয়েছে। তিনিই তা অনাবৃত করে দেখাবেন নির্ধারিত সময়ে। আসমান ও যমীনের জন্য সেটি অতি কঠিন বিষয়। যখন তা তোমাদের উপর আসবে অজান্তেই এসে যাবে। আপনাকে জিজ্ঞেস করতে থাকে, যেন আপনি তার অনুসন্ধানে লেগে আছেন। বলে দিন, এর সংবাদ বিশেষ করে আল্লাহ্র নিকটই রয়েছে। কিন্তু তা অধিকাংশ লোকই উপলব্ধি করে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যাকে আল্লাহ্ তা'আলা পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ পথে আনতে পারে না (কাজেই আক্ষেপ করা বৃথা)। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতার মাঝে উদ্‌ভ্রান্ত ছেড়ে দিয়ে থাকেন (যাতে একত্রেই পূর্ণ শাস্তি প্রদান করতে পারেন)। লোকেরা আপনার কাছে কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করে যে, কখন তা অনুষ্ঠিত হবে। আপনি বলে দিন যে, এর (অনুষ্ঠান সংক্রান্ত) জ্ঞান (অর্থাৎ কখন তা অনুষ্ঠিত হবে তা) শুধু আমার পালনকর্তার কাছেই রয়েছে (অন্য কেউ এ ব্যাপারে জানে না)। এর নির্ধারিত সময়ে একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ একে প্রকাশ করবেন না। (আর প্রকাশের অবস্থা হবে এমন যে, যখন তার অনুষ্ঠান হবে, তখন সবাই জানতে পারবে। নির্ধারিত সময়ের আগে কারও অনুরোধে তা প্রকাশ করা হবে না। কারণ,) সেটা হবে আসমানসমূহ এবং যমীনসমূহের জন্য অতি কঠিন ও বিরাট ঘটনা। (কাজেই) তা তোমাদের উপর (তোমাদের অজান্তে) একান্ত দৈবাৎ এসে উপস্থিত হবে। (ফলে সেটা দেহকে পরিবর্তিত ও বিকৃত করে দেওয়ার ব্যাপারে যেমন কঠিন হবে, তেমনিভাবে অন্তরের পরেও তার কঠিন প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হবে: বস্তুত পূর্ব থেকে বাতলে দেওয়া হলে এমনটা হত না। আর তাদের জিজ্ঞেস করাটাও একান্ত মামুলী প্রশ্ন নয়; বরং) তারা আপনার নিকট এমনই (পীড়াপীড়ি ও প্রবলতার) সাথে জিজ্ঞেস করে যে, আপনি যেন এ বিষয়ে তদন্ত-গবেষণা করে নিয়েছেন (আর এই তদন্ত-গবেষণার পর আপনি তার ব্যাপক জ্ঞানও লাভ করে নিয়েছেন)। আপনি বলে দিন যে, (বর্ণিত) এ ব্যাপারে বিশেষ জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ লোক (এ বিষয়ে) জানে না [যে, কোন কোন বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন নিজের কাছেই সংরক্ষণ করে রেখেছেন। নবী-রসূলদেরও সে ব্যাপারে বিস্তারিত সংবাদ দেননি। সুতরাং এই না জানার দরুন কোন নবীর কিয়ামতের সঠিক সময় সম্পর্কিত অজ্ঞতাকে (নাউযুবিল্লাহ) নবী না হওয়ার প্রমাণ মনে করে—তা এভাবে যে, নবুয়ত সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এই ইলম অপরিহার্য, আর অপরিহার্য বিষয়ের অনুপস্থিতি তার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়েরও অনুপস্থিতির প্রমাণ। অথচ প্রথম পর্বটিই সম্পূর্ণ ভ্রান্ত]।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কুফ্ফার ও মুনকেরীনদের হঠকারিতা এবং আল্লাহ্ তা'আলার মহা কুদরতের প্রকৃষ্ট দলীল-প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও ঈমান না আনার আলোচনা ছিল। আর বর্তমান বিষয়টি রসূলে করীম (সা)-এর জন্য উম্মত এবং সাধারণ সৃষ্টির সাথে তাঁর অসাধারণ প্রীতি ও দয়ার কারণে তাঁর চরম মনোবেদনা ও দুঃখের কারণ হতে পারত বলে আলোচ্য আয়াতগুলোর প্রথম আয়াতে তাঁকে সান্ত্বনা প্রদান করে বলা হয়েছে——যাদেরকে আল্লাহ্ নিজে পথভ্রষ্ট করে দেবেন, তাদেরকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আর আল্লাহ্ তা'আলা এ ধরনের লোকদের পথভ্রষ্টতায় উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায়ই ছেড়ে দেন।

সারমর্ম এই যে, তাদের হঠকারিতা এবং সত্য গ্রহণে অনীহার দরুন তিনি যেন মনঃক্ষুণ্ণ না হন। কারণ, সত্য বিষয়টি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে পেঁৗছে দেওয়াই ছিল তাঁর নির্ধারিত দায়িত্ব। তা তিনি সম্পাদনও করেছেন। তাঁর উপর অর্পিত দায়-দায়িত্বও শেষ হয়ে গেছে। এখন কারও মানা না মানার ব্যাপারটি হল একান্ত ভাগ্য সংক্রান্ত। এতে তাঁর কোন হাত নেই। সুতরাং তিনি কেন দুঃখিত হবেন।

এ সূরার বিষয়বস্তুগুলোর মধ্যে তিনটি বিষয় ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক. তওহীদ। দুই. রিসালত, তিন. আখিরাত। আর এই তিনটি বিষয়ই ঈমান ও ইসলামের মূল ভিত্তি। এগুলোর মধ্যে তওহীদ ও রিসালতের বিষয় পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। উল্লিখিত আয়াতগুলোর মধ্যে শেষ দু'টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে আখিরাত ও কিয়ামত সংক্রান্ত বিষয়। এগুলো নাযিলের পেছনে বিশেষ একটি ঘটনা কার্যকর ছিল। তাই তফসীরে ইমাম ইবনে জরীর (র) এবং আবদ ইবনে হুমাইদ (র) হযরত কাতাদাহ (রা)-এর রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত করেছেন যে, মক্কার কুরাইশরা হুযূরে আকরাম (সা)-এর নিকট ঠাট্টা ও বিদ্রূপচ্ছলে জিজ্ঞেস করল যে, আপনি কিয়ামত আগমনের সংবাদ দিয়ে দিয়ে মানুষকে এ ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে থাকেন——এ ব্যাপারে যদি আপনি সত্য হয়ে থাকেন, তবে নির্দিষ্ট করে বলুন, কিয়ামত কোন্ সনের কত তারিখে অনুষ্ঠিত হবে, যাতে আমরা তা আসার আগেই তৈরি হয়ে যেতে পারি। আপনার এবং আমাদের মাঝে আত্মীয়তার যে সম্পর্ক বিদ্যমান তার দাবিও তাই। আর যদি সাধারণ লোকদের বিষয়টি আপনি বলতে না চান, তবে অন্তত আমাদের বলে দিন। এ ঘটনার ভিত্তিতেই নাযিল হয় يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ আয়াতটি।

এখানে উল্লিখিত ساعة শব্দটি আরবী ভাষায় সামান্য সময় বা মুহূর্তকে বলা হয়। আভিধানিকভাবে যার কোন বিশেষ পরিসীমা নেই। আর গাণিতিক ও জ্যোতির্বিদদের পরিভাষায় রাত ও দিনের চব্বিশ অংশের এক অংশকে বলা হয় ساعة (সাআত) যাকে বাংলায় ঘন্টা নামে অভিহিত করা হয়। কোরআনের পরিভাষায় এ শব্দটি সেই দিবসকে বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়, যা হবে সমগ্র সৃষ্টির মৃত্যুদিবস এবং সে দিনকেও বলা হয়

যাতে সমগ্র সৃষ্টি পুনরায় জীবিত হয়ে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের দরবারে উপস্থিত হবে। أَيَّانَ (আইয়্যানা) অর্থ কবে। আর مُرْسَى (মুরসা) অর্থ অনুষ্ঠিত কিংবা স্থাপিত হওয়া।

لَا يُجَلِّيهَا শব্দটি تَجْلِيَة থেকে গঠিত। এর অর্থ প্রকাশিত এবং খোলা। بَغْتَة (বাগ্তাতান) অর্থ অকস্মাৎ। حَفِيٌّ (হাফিয়্যুন) অর্থ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, জ্ঞানী ও অবহিত ব্যক্তি। প্রকৃতপক্ষে এমন লোককে 'হাফী' বলা হয়, যে প্রশ্ন করে করে বিষয়ের পরিপূর্ণ তথ্য অনুসন্ধান করে নিতে পারে।

কাজেই আয়াতের মর্ম দাঁড়াল এই যে, এরা আপনার নিকট কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করে যে, তা কবে আসবে? আপনি তাদেরকে বলে দিন, এর নির্দিষ্টতার জ্ঞান শুধুমাত্র আমার প্রতিপালকেরই আছে। এ ব্যাপারে পূর্ব থেকে কারও জানা নেই এবং সঠিক সময়ও কেউ জানতে পারবে না। নির্ধারিত সময়টি যখন উপস্থিত হয়ে যাবে, ঠিক তখনই আল্লাহ্ তা'আলা তা প্রকাশ করে দেবেন। এতে কোন মাধ্যম থাকবে না। কিয়ামতের ঘটনাটি আসমান ও যমীনের জন্যও একান্ত ভয়ানক ঘটনা হবে। সেগুলোও টুকরা টুকরা হয়ে উড়তে থাকবে। সুতরাং এহেন ভয়াবহ ঘটনা সম্পর্কে পূর্ব থেকে প্রকাশ না করাই বিচক্ষণতার তাগাদা। তা না হলে যারা বিশ্বাসী তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠত এবং যারা অবিশ্বাসী মুনকির তারা অধিকতর ঠাট্টা-বিদ্রূপের সুযোগ পেয়ে যেত। সেজন্যই বলা হয়েছে ঃ- لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً অর্থাৎ কিয়ামত তোমাদের নিকট আকস্মিকভাবেই এসে উপস্থিত হবে।

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, রসূলে করীম (সা) কিয়ামতের আকস্মিক আগমন সম্পর্কে বলেছেন, 'মানুষ নিজ নিজ কাজে পরিব্যস্ত থাকবে। এক লোক খরিদদারকে দেখাবার উদ্দেশ্যে কাপড়ের থান খুলে সামনে ধরে থাকবে, সে (সওদার) এ বিষয়টিও সাব্যস্ত করতে পারবে না, এরই মধ্যে কিয়ামত এসে যাবে। এক লোক তার উটনীর দুধ দুইয়ে নিয়ে যেতে থাকবে এবং তখনও তা ব্যবহার করতে পারবে না, এরই মধ্যে কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। কেউ নিজের হাউস মেরামত করতে থাকবে—তা থেকে অবসর হওয়ার পূর্বেই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। কেউ হয়তো খাবার লোকমা হাতে তুলে নেবে, তা মুখে দেবার পূর্বেই কিয়ামত হয়ে যাবে।—রূহুল-মা'আনী

যেভাবে মানুষের ব্যক্তিগত মৃত্যুর তারিখ ও সময়-ক্ষণ অনির্দিষ্ট ও গোপন রাখার মাঝে বিরাট তাৎপর্য নিহিত রয়েছে, তেমনিভাবে কিয়ামতকেও, যা সমগ্র বিশ্বের সামগ্রিক মৃত্যুরই নামান্তর, তাকে গোপন এবং অনির্দিষ্ট রাখার মধ্যেও বিপুল রহস্য ও তাৎপর্য বিদ্যমান। তা না হলে একে তো এতেই বিশ্বাসীদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে এবং পার্থিব

যাবতীয় কাজকর্ম অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়াবে, তদুপরি অবিশ্বাসীরা সুদীর্ঘ সময়ের কথা শুনে ঠাট্টা-বিদ্রূপের সুযোগ পাবে এবং তাদের ঔদ্ধত্য অধিকতর বৃদ্ধি পাবে।

সেজন্যই হিকমত ও বিচক্ষণতার তাগিদে তার তারিখ বা দিন-ক্ষণকে অনির্দিষ্ট রাখা হয়েছে, যাতে করে মানুষ তার ভয়াবহতা সম্পর্কে সদা ভীত থাকে। আর এ ভয়ই মানুষকে অপরাধপ্রবণতা থেকে বিরত রাখার জন্য সর্বাধিক কার্যকর পন্থা। সুতরাং উক্ত আয়াতগুলোতে এ জ্ঞানই দেওয়া হয়েছে যে, কোন একদিন কিয়ামতের আগমন ঘটবে, আল্লাহ্‌র সমীপে সবারই উপস্থিত হতে হবে এবং তাদের সারা জীবনের ছোট-বড়, ভাল-মন্দ সমস্ত কার্যকলাপের নিকাশ নেওয়া হবে, যার ফলে হয় জান্নাতের অকল্পনীয় ও অনন্ত নিয়ামতরাজি লাভ হবে অথবা জাহান্নামের সেই কঠিন ও দুর্বিষহ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে, যার কল্পনা করতেও পিত্ত পানি হয়ে যেতে থাকবে। যখন কারও বিশ্বাস ও প্রত্যয় থাকবে, তখন কোন বুদ্ধিমানের কাজ এমন হওয়া উচিত নয় যে, আমলের অবকাশকে এমন বিতর্কের মাঝে নষ্ট করবে যে, এ ঘটনা কবে কখন সংঘটিত হবে। বরং বুদ্ধিমত্তার সঠিক দাবি হল বয়সের অবকাশকে গনীমত মনে করে সে দিবসের জন্য তৈরি হওয়ার কাজে ব্যাপৃত থাকা এবং আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের নির্দেশ লংঘন করতে গিয়ে এমনভাবে ভয় করা, যেমন আগুনকে ভয় করা হয়।

আয়াতের শেষাংশে পুনরায় তাদের প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে বলা হয়েছে ঃ يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا প্রথম প্রশ্নটি ছিল এ প্রসঙ্গে যে, এমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যখন সংঘটিত হবেই তখন আমাদের তার যথাযথ ও সঠিক তারিখ, দিন-ক্ষণ ও সময় সম্পর্কে অবহিত করা প্রয়োজন। তারই উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, এ প্রশ্নটি একান্ত নির্বুদ্ধিতা ও বোকামিপ্রসূত। পক্ষান্তরে বুদ্ধিমত্তার দাবি হল এর নির্দিষ্টতা সম্পর্কে কাউকে অবহিত না করা, যাতে প্রত্যেক আমলকারী প্রতি মুহূর্তে আখিরাতের আযাবের ভয় করে নেক-আমল অবলম্বন করার এবং অসৎ কর্ম থেকে বিরত থাকার প্রতি পরিপূর্ণ মনোযোগী হয়।

আর এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উদ্দেশ্য হল তাদের একথা বোঝা যে, মহানবী (সা) অবশ্যই কিয়ামতের তারিখ ও সময়-ক্ষণ সম্পর্কে অবগত এবং আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে এ বিষয়ে অবশ্যই তিনি জ্ঞান লাভ করে নিয়েছেন, কিন্তু তিনি কোন বিশেষ কারণে সে কথা বলছেন না। সেজন্যই নিজ আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে তারা তাঁকে প্রশ্ন করল যে, আমাদের কিয়ামতের পরিপূর্ণ সন্ধান দিয়ে দিন। এ প্রশ্নের উত্তরে ইরশাদ হয়েছে ঃ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ অর্থাৎ আপনি লোকদের বলে দিন যে, প্রকৃতপক্ষে কিয়ামতের সঠিক তারিখ সম্পর্কিত জ্ঞান এক মাত্র আল্লাহ্ ছাড়া তাঁর কোন ফেরেশতা কিংবা নবী-রসূলদেরও জানা

নেই। কিন্তু এ বিষয়টি অনেকেই জানে না যে, বহু জ্ঞান আল্লাহ্ শুধুমাত্র নিজের জন্যই সংরক্ষণ করেন, যা কোন ফেরেশতা কিংবা নবী-রসূল পর্যন্ত জানতে পারেন না। মানুষ নিজেদের মূর্খতাবশত মনে করে যে, কিয়ামত অনুষ্ঠানের তারিখ সম্পর্কিত জ্ঞান নবী কিংবা রসূল হওয়ার জন্য অপরিহার্য। এরই ভিত্তিতে তারা এই প্রেক্ষিত আবিষ্কার করে যে, মহানবী (সা)-র যখন এ ব্যাপারে পরিপূর্ণ ইল্‌ম নেই, কাজেই এটা তাঁর নবী না হওয়ারই লক্ষণ (নাউযুবিল্লাহ)। কিন্তু উপরোল্লিখিত আলোচনায় জানা গেছে যে, এ ধরনের ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

সারকথা হল এই যে, যারা এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করে, তারা বড়ই বোকা, নির্বোধ ও অজ্ঞ। না এরা বিষয়ের তাৎপর্য সম্পর্কে অবগত, না জানে তার অন্তর্নিহিত রহস্য ও প্রশ্ন করার পদ্ধতি।

তবে হ্যাঁ, মহানবী (সা)-কে কিয়ামতের কিছু নিদর্শন ও লক্ষণাদি সম্পর্কিত জ্ঞান দান করা হয়েছে। আর তা হল এই যে, এখন তা নিকটবর্তী। এ বিষয়টি মহানবী (সা) বহু বিশুদ্ধ হাদীসে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে—"আমার আবির্ভাব এবং কিয়ামত এমনভাবে মিশে আছে, যেমন মিশে থাকে হাতের দু'টি আঙ্গুল।"—তিরমিযী

কোন কোন ইসলামী কিতাবে পৃথিবীর বয়স সাত হাজার বছর হয়েছে বলে যে কথা বলা হয়েছে, তা হুযূর আকরাম (সা)-এর কোন হাদীস নয় বরং তা ইসরাঈলী মিথ্যা রেওয়ায়েত থেকে নেয়া বিষয়।

ভূমণ্ডল বিষয়ক পণ্ডিতরা আধুনিক গবেষণার মাধ্যমে পৃথিবীর বয়স লক্ষ লক্ষ বছর হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। কোরআনের কোন আয়াত কিংবা কোন বিশুদ্ধ হাদীসের সাথে এ নতুন গবেষণার কোন বিরোধ ঘটে না। ইসলামী রেওয়ায়েতসমূহে এহেন অলীক রেওয়ায়েত ঢুকিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যই হয়ত ইসলামের বিরুদ্ধে মানুষের মনে কু-ধারণা সৃষ্টি করা. যার খণ্ডন স্বয়ং বিশুদ্ধ হাদীসেও বিদ্যমান রয়েছে। বিশুদ্ধ এক হাদীসে রসূলে করীম (সা) স্বয়ং স্বীয় উম্মতকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন যে, "পূর্ববর্তী উম্মতদের তুলনায় তোমাদের উদাহরণ এমন, যেন এক কালো বলদের গায়ে একটা সাদা লোম।" এতে যে কেউ অনুমান করতে পারে যে, হুযূর (সা)-এর দৃষ্টিতেও পৃথিবীর বয়স এত দীর্ঘ, যার অনুমান করাও কঠিন। সে কারণেই হাফেয ইবনে হায্‌ম উন্দুলুসী বলেছেন যে, আমাদের বিশ্বাস, দুনিয়ার বয়স সম্পর্কে সঠিক কোন ধারণা করা যায় না; তার সঠিক জ্ঞান শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তারই রয়েছে।—মুরাগী

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ وَلَوْ كُنْتُ
اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۛ وَمَا مَسَّنِىَ السُّوْٓءُ ۛ اِنْ اَنَا

إِلَّا نَذِيرٌ وَّبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُونَ ﴿١٨٨﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن
نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا
تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۚ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا
اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾
فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا ۚ فَتَعَالَى
اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٩٠﴾ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَّهُمْ
يُخْلَقُونَ ﴿١٩١﴾ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَّلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿١٩٢﴾
وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ ۚ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ
أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ ﴿١٩٣﴾

(১৮৮) আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ সাধনের এবং অকল্যাণ সাধনের মালিক নই, কিন্তু যা আল্লাহ্ চান। আর আমি যদি গায়েবের কথা জেনে নিতে পারতাম, তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করে নিতে পারতাম। ফলে আমার কোন অমঙ্গল কখনও হতে পারত না। আমি তো শুধুমাত্র একজন ভীতিপ্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা ঈমান-দারদের জন্য। (১৮৯) তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র সত্তা থেকে আর তা থেকেই তৈরী করেছেন তার জোড়া, যাতে তার কাছে স্বস্তি পেতে পারে। অতপর পুরুষ যখন নারীকে আবৃত করল, তখন সে গর্ভবতী হল; অতি হালকা গর্ভ। সে তাই নিয়ে চলাফেরা করতে থাকলো। তারপর যখন বোঝা হয়ে গেল, তখন উভয়েই আল্লাহ্কে ডাকল যিনি তাদের পালনকর্তা যে, তুমি যদি আমাদেরকে সুস্থ ও ভাল দান কর তবে আমরা তোমার শুক্রিয়া আদায় করব। (১৯০) অতপর তাদেরকে যখন সুস্থ ও ভাল দান করা হল, তখন দানকৃত বিষয় তাঁর অংশীদার তৈরী করতে লাগল। বস্তুত আল্লাহ্ তাদের শরীক সাব্যস্ত করা থেকে বহু উর্ধ্বে। (১৯১) তারা কি এমন কাউকে শরীক সাব্যস্ত করে যে একটি বস্তুও সৃষ্টি করেনি; বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। (১৯২) আর তারা না তাদের সাহায্য করতে পারে, না নিজের সাহায্য করতে পারে। (১৯৩) আর তোমরা যদি তাদেরকে আহ্বান কর সুপথের দিকে, তবে তারা তোমাদের আহ্বান অনুযায়ী চলবে না। তাদেরকে আহ্বান জানানো কিংবা নীরব থাকা দুই-ই তোমাদের জন্য সমান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (তাদেরকে) বলে দিন যে, আমি নিজে আমার নির্দিষ্ট সত্তার জন্যও কোন (সৃষ্টি সংক্রান্ত) কল্যাণ সাধনের অধিকার সংরক্ষণ করি না (অপরের জন্য তো দূরের কথা।) আর না (সৃষ্টি সংক্রান্ত কোন) ক্ষতি (প্রতিরোধের অধিকার আমার রয়েছে।) তবে এতটুকুই (করতে পারি) যতটা আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন (অর্থাৎ আমাকে অধিকার দান করবেন। আর যে ব্যাপারে অধিকার দেননি, তাতে অনেক সময় লাভ নষ্ট হয়ে যায় এবং ক্ষতি সাধিত হয়। একটি তো গেল এই বিষয়ঃ) আর (দ্বিতীয় বিষয়টি হল এই যে,) আমি যদি গায়েবের বিষয় জেনে থাকতাম (ঐচ্ছিক ব্যাপার-গুলোতে), তাহলে আমি (নিজের জন্য) বহু কল্যাণ লাভ করে নিতে পারতাম এবং কোন অকল্যাণই আমার উপর পতিত হতে পারত না। (কারণ, গায়েব সম্পর্কিত ইল্‌মের দ্বারা জেনে নিতাম যে, অমুক বিষয় আমার জন্য নিশ্চিত মঙ্গলজনক হবে; তখন তাই গ্রহণ করে নিতাম। আর জানতে পারতাম যে, অমুক বিষয়টি আমার জন্য নিশ্চিত ক্ষতিকর, তখন তা থেকে বিরত থাকতাম। পক্ষান্তরে এখন যেহেতু ইলমে-গায়েব নেই, সেহেতু অনেক সময় কল্যাণ সম্পর্কে জানাই থাকে না যে, তা গ্রহণ করব। তেমনি-ভাবে ক্ষতি সম্পর্কেও জানা থাকে না যে, তা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। বরং অনেক সময় উপকারীকে অপকারী এবং অপকারীকে উপকারী বলে মনে করে নেয়া হয়। এ যুক্তির সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে, ইল্‌মে-গায়েবের পক্ষে ইষ্ট-অনিষ্ট উভয়টির উপর ক্ষমতা লাভ হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এতে স্পষ্টরূপে বোঝা গেল যে, আমি এ রকম ইলমে গায়েব অবগত নই।

যাই হোক, আমার এমন বিষয়ের জ্ঞান নেই; আমি শুধু (শরীয়তের বিধি-বিধান বাতলিয়ে তার সওয়াব সম্পর্কে) সুসংবাদদাতা এবং (আযাব সম্পর্কে) ভীতি প্রদর্শনকারী—(সে সমস্ত লোকদের জন্য যারা) ঈমানের অধিকারী।—(সারার্থ এই যে, নবুয়তের প্রকৃত উদ্দেশ্য সৃষ্টি সংক্রান্ত বিষয়সমূহকে পরিবেষ্টিত করা নয়। কাজেই সে সমস্ত বিষয়ের জ্ঞানপ্রাপ্তিও নবীর জন্য অপরিহার্য নয়, যাতে কিয়ামত নির্ধারণের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত। অবশ্যই নবুয়তের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল শরীয়তের প্রচুর জ্ঞান। বস্তুত তা আমার রয়েছে।) সেই আল্লাহ্ এমনই (ক্ষমতাশীল ও কল্যাণদাতা), তিনি তোমাদের একটি মাত্র দেহ (অর্থাৎ আদম দেহ) থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকেই তার জোড়া তৈরী করেছেন (অর্থাৎ হযরত হাওয়াকে তৈরী করেছেন। এর বর্ণনা সূরা নিসার তফসীর প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে)। যাতে সে তার সেই জোড়ার দ্বারা আকর্ষণ লাভ করতে পারে। (সুতরাং তিনি যখন স্রষ্টাও এবং অনুগ্রহকারী দাতাও, তখন ইবাদত লাভও একমাত্র তাঁরই অধিকার।) অতপর (পরবর্তীতে আদমের সন্তান-সন্ততি বেড়েছে এবং তাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী রয়েছে, কিন্তু তাদের কারো কারো অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে,) যখন স্বামী স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে, তখন তার গর্ভ সঞ্চারিত হয়েছে (যা প্রথমদিকে) ছিল সামান্য ও হালকা, ফলে সে তা পেটে নিয়ে (নির্বিঘ্নে) চলাফেরা করেছে, (কিন্তু) পরে যখন সে গর্ভ (বৃদ্ধির কারণে) ভারী হয়ে যায় (এবং

স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের মনেই বিশ্বাস জন্মে যে, এটা অবশ্যই সন্তানের গর্ভ,) তখন (তাদের মনে নানা রকম কল্পনা ও আশংকা হতে থাকে। সুতরাং) স্বামী-স্ত্রী উভয়ে স্বীয় মালিক আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোয়া-প্রার্থনা করতে আরম্ভ করে যে, তুমি যদি আমাদিগকে সুস্থ-সঠিক সন্তান দান কর তাহলে আমরা (তোমার) অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব। (যেমন, সাধারণ অভ্যাস রয়েছে যে, যখনই মানুষ বিপদে পড়ে, তখনই আল্লাহ্ তা'আলার সাথে বড় বড় প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি দান করে) তেমনিভাবে আল্লাহ্ যখন তাদেরকে সুস্থ-সবল সন্তান দান করলেন তখন তারা উভয়ে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিষয়ে আল্লাহ্র সাথে বিভিন্ন শরীক সাব্যস্ত করতে লাগল। [কেউ এমন বিশ্বাস পোষণের মাধ্যমে যে, এ সন্তান অমুক জীবিত অথবা মৃত ব্যক্তি দিয়েছে। আবার কেউ কার্যকলাপের মাধ্যমে; তাদের নামে নযর-নিয়ায মানত করে কিংবা শিশুকে নিয়ে শরীককৃত বস্তুর সামনে মাথা ঠেকিয়ে অথবা কথার মাধ্যমে—তার দাসত্বের সাথে যুক্ত করে আব্দে শামস্ (সূর্যদাস) বান্দায়ে-আলী প্রভৃতি তাদের অন্যান্য উপাস্য দেব-দেবীর সাথে যুক্ত করে নাম রাখার মাধ্যমে। অথচ আল্লাহ্ পাক যে তাদের সন্তান দান করেন তার কৃতজ্ঞতা তাঁরই দরবারে নিবেদন করা উচিত ছিল। কিন্তু তারা নিবেদন করল অন্য বাতিল মা'বুদের নিকট।] বস্তুত আল্লাহ্ স্বীয় শরীক বা অংশীদারিত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। (এ পর্যন্ত ছিল আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলীর উল্লেখ, যা তাঁর মা'বুদ বা উপাস্য হওয়ারই পরিচায়ক। পরবর্তীতে মিথ্যা উপাস্যসমূহের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা হচ্ছে, যা সেগুলোর উপাস্য হওয়ার অযোগ্যতার পরিচায়ক। বলা হচ্ছে,) তোমরা কি (আল্লাহ্ তা'আলার সাথে) এমন সব বস্তুকে অংশীদার সাব্যস্ত করছ, যা কোন কিছু তৈরী করতে পারে না এবং (অবশ্যই যা অন্যের দ্বারা তৈরী হয়ে থাকে? এটা স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যে, পৌত্তলিকরা নিজেরাই মূর্তি নির্মাণ করে নেয়।) তাছাড়া (কোন কিছু তৈরী করা তো দূরের কথা,) সেগুলো এতই অক্ষম যে, এর চেয়ে কোন সহজ কাজও করতে পারে না। যেমন পারে না তাদেরকে সামান্য সাহায্য করতেও। আর (শুধু তাই নয়,) তারা নিজেদেরও কোন সাহায্য করতে পারে না। তাদের উপর যদি কোন দুর্ঘটনা এসে উপস্থিত হয়; (সেগুলোকে যদি কেউ ভেঙ্গে-চুরে দিতে আরম্ভ করে) এবং (এমনকি) তোমরা যদি কোন কথা শোনার জন্য তাদেরকে আহবান কর, তবে তারা তোমাদের আহবানে (সাড়া দিতেও) এগিয়ে আসতে পারে না। (এর দু'টি অর্থ হতে পারে। প্রথমত এই যে, তোমরা যদি তাদেরকে কোন বিষয় বাতলে দিতে বল, তবে তারা তা বাতলে দিতে পারে না। আর দ্বিতীয়ত তোমরা যদি তাদেরকে ডাক যে, এসো আমরাই তোমাদের কিছু বলে দিই, তাহলে তারা তোমাদের সে ডাকে সাড়া দেয় না। অর্থাৎ তোমাদের কথামত কাজ করতে পারে না। সে যা হোক, যখন তারা শোনে না, তখন) তাদেরকে ডাকা অথবা চুপ করে থাকা তোমাদের পক্ষে দুই-ই সমান। (চুপ করে থাকার ক্ষেত্রে শোনার তো প্রশ্নই ওঠে না। সারমর্ম হল এই যে, কোন কথা বলার জন্য ডাকলে তা শুনে নেয়ার মত এমন সহজ কাজটিও যখন তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তখন এর চাইতে কঠিন কাজ আত্মরক্ষা কিংবা তার চেয়েও কঠিন কাজ অন্যের সাহায্য করা অথবা আরও কঠিন কোন কিছু সৃষ্টি করার

মত কাজ করা তো কিছুতেই সম্ভব নয়। এরা সম্পূর্ণভাবে অক্ষম। কাজেই এহেন অক্ষম কোন বস্তু কেমন করে উপাস্য হতে পারে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রথম আয়াতে মুশরিক ও সাধারণ মানুষের সেই ভ্রান্ত আকীদার খণ্ডন করা হয়েছে; যা তারা নবী-রসূলদের ব্যাপারে পোষণ করত যে, তাঁরা গায়েবী বিষয়েও অবগত রয়েছে! তাঁদের জ্ঞানও আল্লাহ্‌র মতই সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে পরিব্যাপ্ত এবং তাঁরা কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক। যাকে ইচ্ছা কল্যাণ দান কিংবা যার জন্য ইচ্ছা অকল্যাণ করার ক্ষমতাও তাদেরই হাতে।

এ বিশ্বাসের দরুনই তারা রসূলে করীম (সা)-এর নিকট কিয়ামতের নির্দিষ্ট তারিখ জানতে চাইত। এ বিষয়ের আলোচনা পূর্ববর্তী আয়াতে করা হয়েছে।

এ আয়াতে তাদের এই শেরেকী আকীদার খণ্ডন উপলক্ষে বলা হয়েছে যে, ইল্‌মে-গায়েব এবং সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুর ব্যাপক ইল্‌ম শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই রয়েছে। এটা তাঁরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এতে কোন সৃষ্টিকে অংশীদার সাব্যস্ত করা, তা ফেরেশতাই হোক আর নবী ও রসূলগণই হোক, শেরেকী এবং মহাপাপ। তেমনি-ভাবে প্রত্যেক লাভ-ক্ষতি কিংবা মঙ্গলামঙ্গলের মালিক হওয়াও এককভাবে আল্লাহ্ তা'আলারই গুণ। এতে কাউকে অংশীদার দাঁড় করানোও শেরেকী। বস্তুত এই শেরেকী বা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সাথে কোন অংশীদারিত্বের আকীদাকে খণ্ডন করার জন্যই কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং রসূলে মকবুল (সা)-এর আবির্ভাব ঘটেছে।

কোরআনে করীম তার অসংখ্য আয়াতে এ বিষয়টি একান্ত প্রকৃষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছে। ইরশাদ হয়েছে, ইলমে-গায়েব এবং ব্যাপক জ্ঞান, যে জ্ঞানের বাইরে কোন কিছুই থাকতে পারে না, তা শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই একক গুণ। তেমনি সাধারণ ক্ষমতা, অর্থাৎ যাবতীয় কল্যাণ-অকল্যাণ, লাভ-লোকসান সবই যার অন্তর্ভুক্ত তাও আল্লাহ্‌র একক গুণ। এতে আল্লাহ ছাড়া অপর কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা শিরক।

এ আয়াতে মহানবী (সা)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে; আপনি ঘোষণা করে দিন যে, আমি নিজের লাভ-ক্ষতিরও মালিক নই—অন্যের লাভ-ক্ষতি তো দূরের কথা!

এভাবে তিনি যেন এ কথাও ঘোষণা করে দেন যে, আমি আলেমে-গায়েব নই যে, যাবতীয় বিষয়ের পূর্ণ জ্ঞান আমার থাকা অনিবার্য হবে। তাছাড়া আমার যদি গায়েবী জ্ঞান থাকতই, তবে আমি প্রত্যেকটি লাভজনক বস্তুই হাসিল করে নিতাম, কোন একটি লাভও আমার হাতছাড়া হতে পারত না। আর প্রতিটি ক্ষতিকর বিষয় থেকে সর্বদা রক্ষিত থাকতাম। কখনও কোন ক্ষতি আমার ধারে-কাছে পর্যন্ত পৌঁছতে পারত না। অথচ এতদুভয় বিষয়ের কোনটিই বাস্তব নয়। বহু বিষয় রয়েছে যা রসূলে

করীম (সা) আয়ত্ত করতে চেয়েছেন, কিন্তু তা করতে পারেননি। তাছাড়া বহু দুঃখকষ্ট রয়েছে যা থেকে আত্মরক্ষার জন্য তিনি ইচ্ছা করেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাতে পতিত হতে হয়েছে। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় হুযূর (সা) এহরাম বেঁধে সাহাবায়ে-কিরামের সাথে ওমরা করার উদ্দেশ্যে হেরেমের সীমানা পর্যন্ত এগিয়ে যান, কিন্তু হেরেম শরীফে প্রবেশ কিংবা ওমরা করা তখনও সম্ভব হতে পারেনি; সবাইকে এহরাম খুলে ফিরে আসতে হয়েছে।

তেমনিভাবে ওহুদ যুদ্ধে মহানবী (সা) আহত হন এবং মুসলমানদের সাময়িক পরাজয় বরণ করতে হয়। এমনি আরও বহু অতি প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে যা মহানবী (সা)-র জীবনে সংঘটিত হয়েছে।

আর এমনসব ঘটনা প্রকাশের উদ্দেশ্যও হয়তো এই ছিল, যাতে মানুষের সামনে কার্যত এ কথা স্পষ্ট করে দেয়া যায় যে, নবী-রসূলগণ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সবচেয়ে বেশি উত্তম ও প্রিয় সৃষ্টি, কিন্তু তবুও তাঁরা খোদায়ী জ্ঞান ও শক্তির অধিকারী নন। এভাবে সুস্পষ্ট করে দেয়ার উদ্দেশ্যও এই, যাতে মানুষ এমন কোন বিভ্রান্তিতে পতিত না হয় যে, নবী-রসূলরা আল্লাহ্র গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যাবলীর অধিকারী। যেমন, ইহুদী-খৃস্টানরা এমনিভাবে নিজেদের রসূলদের সম্পর্কে আল্লাহ্র গুণাবলীর অধিকারী হওয়ার বিশ্বাস করে শির্ক ও কুফরে পতিত হয়েছিল।

এ আয়াত এ কথাও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, নবী-রসূলরা সর্বশক্তিমানও নন এবং ইল্‌মে-গায়েবেরও মালিক নন, বরং তাঁরা জ্ঞান ও কুদরতের ততটুকুরই অধিকারী হয়েছিলেন, যতটা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁদেরকে নিজের পক্ষ থেকে দান করেছিলেন।

অবশ্য এতে কোন রকম সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই যে, তাঁদেরকে জ্ঞানের যতটা অংশ দান করা হয়েছে, তা সমগ্র সৃষ্টির সমষ্টিগত জ্ঞানের চাইতেও বহু বেশি। বিশেষ করে আমাদের রসূলে করীম (সা)-কে তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমগ্র সৃষ্টির সমপরিমাণ জ্ঞান দান করা হয়েছে। অর্থাৎ সমস্ত নবী-রসূলের যে পরিমাণ জ্ঞান দান করা হয়েছে সে সমুদয় এবং তার চেয়েও বহুগুণ বেশি জ্ঞান দান করা হয়েছিল। আর এই দানকৃত জ্ঞান অনুযায়ী তিনি শত-সহস্র গোপন বা সাধারণভাবে অজানা বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন, যার সত্যতা সম্পর্কে সাধারণ-অসাধারণ নির্বিশেষে সবাই প্রত্যক্ষ করেছেন। ফলে বলা যেতে পারে যে, রসূলে করীম (সা)-কে লক্ষ লক্ষ গায়েবী বিষয়ের জ্ঞান দান করা হয়েছিল। কিন্তু একে কোরআনের পরিভাষায় ইলমে গায়েব বলা হয় না, কাজেই রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জ্ঞানকে ইলমে-গায়েব বলা যেতে পারে না।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ অর্থাৎ মহানবী (সা) যেন এ ঘোষণাও করে দেন যে, আমার উপর অর্পিত

দায়িত্ব হল অসৎকর্মীদের আযাবের ভীতি প্রদর্শন করা এবং সৎকর্মশীল মু'মিনদের মহা-দানের সুসংবাদ শোনানো।

দ্বিতীয় আয়াতে ইসলামের সর্ববৃহৎ মৌলিক বিশ্বাস, তওহীদ বা আল্লাহ্‌র একত্ব-বাদের কথা আলোচিত হয়েছে। আর সেই সঙ্গেই এসেছে শিরকের অযৌক্তিকতা ও অসারতার বিস্তারিত বিবরণ।

আয়াতের প্রারম্ভে আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন স্বীয় অসীম ও পরিপূর্ণ ক্ষমতার একটি নিদর্শন হযরত আদম ও হাওয়ার জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ- خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا অর্থাৎ এটা আল্লাহ্ তা'আলারই কুদরত, যিনি সমস্ত আদম সন্তানকে একটিমাত্র সত্তা আদম থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকেই সৃষ্টি করেছেন তাঁর স্ত্রী হাওয়াকেও। যার উদ্দেশ্য ছিল, হযরত আদম যেন সমপর্যায়ের সঙ্গিনীর মাধ্যমে প্রশান্তি লাভ করতে পারেন।

আল্লাহ্ তা'আলার এই আশ্চর্য সৃষ্টির দাবি ছিল, যাতে আদম সন্তানরা সবসময় তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকে এবং কোন সৃষ্টিকেই যেন তাঁর পরিপূর্ণ গুণাবলীতে অংশীদার সাব্যস্ত না করে। কিন্তু গাফিল মানবজাতি করেছে তার বিপরীত। তারই বর্ণনা দেয়া হয়েছে এ আয়াতের দ্বিতীয় বাক্য এবং তার পরবর্তী আয়াতে। বলা হয়েছে ঃ

فَلَمَّا تَغَشّٰهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ۚ فَلَمَّآ اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ۝ فَلَمَّآ اٰتٰهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَآ اٰتٰهُمَا ۚ فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

অর্থাৎ আদম সন্তানরা নিজেদের গাফলতি ও অকৃতজ্ঞতার দরুন এ বিষয়ে এমন কাজ করেছে যে, যখন নারী-পুরুষের সংমিলনের ফলে গর্ভসঞ্চারিত হয়েছে, তখন প্রথম দিকে যতক্ষণ পর্যন্ত গর্ভের কোন বোঝা অনুভূত হয়নি, ততক্ষণ নারী একান্ত স্বাধীনভাবে চলা-ফেরা করেছে। অতপর আল্লাহ্ যখন তিনটি অন্ধকারের মধ্যে সে গর্ভের পরিচর্যার ব্যবস্থা করে তাকে বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং তার বোঝা অনুভব করতে আরম্ভ করেছে, তখন পিতা-মাতা উভয়ে চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছে এবং শংকা অনুভব করতে শুরু করেছে যে, এ গর্ভ থেকে না জানি কেমন সন্তানের জন্ম হবে! কারণ, কোন কোন সময় মানুষের পেট থেকে অদ্ভুত ধরনের সৃষ্টিরও জন্ম হতে দেখা যায়। আবার অনেক

সময় অসম্পূর্ণ, বিকলাঙ্গ সন্তানের জন্ম হয়। এই আশংকার কারণে পিতামাতা প্রার্থনা করতে আরম্ভ করে, ইয়া পরওয়ারদিগার, আমাদের সবদিক দিয়ে পরিপূর্ণ, অবিকলাঙ্গ সন্তান দান কর। সঠিক ও পরিপূর্ণ সন্তান হলে আমরা কৃতজ্ঞ হব।

কিন্তু আল্লাহ্ যখন তাদের দোয়া কবূল করে নিয়ে পরিপূর্ণ, অবিকলাঙ্গ সন্তান দান করলেন, তখন কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে তারা শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ল। এই সন্তানই হল তাদের শিরকে লিপ্ত হওয়ার কারণ। আর এই লিপ্ততা বিভিন্নভাবেই হতে পারে। কখনও বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায় এবং মনে করে বসে যে, এ সন্তান কোন ওলী বা বুযুর্গ ব্যক্তিই দান করেছেন। কখনও এ শিশুকে কোন জীবিত বা মৃত ওলী-দরবেশের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে তার নামে নযর-নিয়ায দিতে শুরু করে কিংবা শিশুকে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁর সামনে তার মাথা মাটিতে ঠেকিয়ে দেয় (যাকে ষাষ্টাঙ্গ প্রণাম বলা হয়)। আবার কখনও শিশুর নাম রাখতে গিয়ে শিরকী পদ্ধতি অবলম্বন করে---আব্দুল্লাহ, আব্দুল ওয্যা, আবদে শামস কিংবা বন্দে আলী প্রভৃতি নাম রেখে দেয়, যাতে বোঝা যায় যে, এ সন্তান আল্লাহ্ তা'আলার পরিবর্তে সে দেব-দেবী কিংবা দরবেশ-সন্ন্যাসীদের সৃষ্ট বান্দা বা দাস। এ সবই হল শিরকী বিশ্বাস ও কাজ, যা আল্লাহ্র দানের শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে অকৃতজ্ঞতারই বিভিন্ন রূপ।

তৃতীয় আয়াতের শেষভাগে এহেন লোকদের বিপথগামিতা ও পথভ্রষ্টতার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ---فَتَعَالَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ অর্থাৎ তারা যে শিরক অবলম্বন করেছে, তা থেকে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র।

উল্লিখিত আয়াতের এ তফসীর বা বিশ্লেষণের দ্বারা এ কথাই সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ আয়াতের প্রথম বাক্যটিতে হযরত আদম ও হাওয়ার উল্লেখ করে আদম সন্তান-দের তাঁর আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আর পরবর্তী বাক্যগুলোতে পরবর্তীকালে আগত আদম সন্তানদের পথভ্রষ্টতা ও গোমরাহীর বিষয় আলোচনা করা হয়েছে যে, তারা কৃতজ্ঞতা অবলম্বনের পরিবর্তে শিরক বা আল্লাহ্র সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করেছে।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, শিরক অবলম্বনকারীদের বিষয়টি আদম কিংবা হাওয়ার সঙ্গে আদৌ সম্পর্কযুক্ত নয়, যার ফলে হযরত আদম (আ)-এর পবিত্রতা সম্পর্কে কোন সংশয় সৃষ্টি হতে পারে। বরং তার সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবেই আগত বংশধরদের কার্য-কলাপের সাথে। এ প্রসঙ্গে আমরা যা ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছি, তফসীরে দুররে মনসূরেও হযরত ইবনে মুন্যির ও ইবনে আবী হাতেম (র)-এর রেওয়ায়েতক্রমে মুফাস্সিরে কোরআন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে তাই উদ্ধৃত রয়েছে।

তিরমিযী ও হাকেমের রেওয়ায়েতে শয়তান কর্তৃক হযরত আদম ও হাওয়া (আ)-কে ধোঁকা দেয়া বা প্রতারণা করার যে কাহিনী বর্ণিত রয়েছে কোন কোন মনীষী তাকে ইসরাঈলী মিথ্যাচার বলে আখ্যায়িত করে ও সেগুলোকে বিশ্বাসের অযোগ্য বলে

সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু অনেক মুহাদ্দিস্ সেগুলোকে অনুমোদনও করেছেন। আলোচ্য তফসীর প্রসঙ্গে যদি সেগুলোকে সত্য বলে ধরে নেয়া যায়, তাতেও আয়াতের তফসীরে কোন সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ থাকে না।

যা হোক, এ আয়াত থেকে কয়েকটি বিধান ও জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যায়—

প্রথমত এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা নারী ও পুরুষের জোড়াকে একই উপাদানে তৈরি করেছেন, যাতে তাদের মধ্যে স্বভাবগত সামঞ্জস্য ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি সাধিত হতে পারে এবং বৈবাহিক জীবনের সাথে সাথে বিশ্ব গঠনের যে স্বার্থ জড়িত তাও যেন যথার্থভাবে বাস্তবায়িত হয়।

দ্বিতীয়ত বৈবাহিক বা দাম্পত্য জীবনের যে সমস্ত অধিকার ও দায়িত্ব স্বামী-স্ত্রীর উপর আরোপিত হয়, সে সবের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল শান্তি লাভ। পৃথিবীর আধুনিক সামাজিকতা ও প্রথা-প্রচলনের যেসব বিষয় মানসিক স্বস্তিকে ধ্বংস করে দেয়, সেগুলো বৈবাহিক সম্পর্কের জাতশত্রু। তাছাড়া বর্তমান সভ্য পৃথিবীতে সাধারণত বৈষয়িক জীবনে যেসব তিক্ততা পরিলক্ষিত হয় এবং চারদিকে তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদের যে ছড়াছড়ি দেখা যায়, তার সবচাইতে বড় কারণ হচ্ছে এই যে, বর্তমানে সমাজে সাধারণত এমন কিছু বিষয়কে কল্যাণকর মনে করে নেয়া হয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষে বৈষয়িক জীবনে শান্তি ও স্বস্তিকে বরবাদ করে দেয়। নারী স্বাধীনতার নামে তাদের বেপর্দা চলাফেরাও যে বিশ্বময় লজ্জাহীনতার ঝড় উঠেছে, দাম্পত্য জীবনের শান্তিকে ধ্বংস করার কাজে তার বিপুল দখল রয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয় যে, নারী সমাজের মাঝে পর্দাহীনতা ও নির্লজ্জতার যত দ্রুত ব্যাপ্তি ঘটছে, সে গতিতেই বৈষয়িক শান্তিও তিরোহিত হয়ে যাচ্ছে।

তৃতীয়ত, সন্তান সন্ততির এমন ধরনের নামকরণ করা, যাতে শিরকী অর্থ নেয়া যায়। নামকরণকারীদের তেমন উদ্দেশ্য না থাকলেও তা শিরকী প্রথা হওয়ার কারণে মহাপাপ। যেমন, আবদে শাম্স (সূর্য দাস), আব্দুল ওয্যা প্রভৃতি নাম রাখা।

চতুর্থত, সন্তানদের নাম রাখার ক্ষেত্রেও কৃতজ্ঞতাসূচক পন্থা হল, আল্লাহ্ ও রসূলের নামের সাথে যুক্ত করে নাম রাখা। সে কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা) আবদুল্লাহ্, আবদুর রহমান প্রভৃতি নাম পছন্দ করেছেন।

পরিতাপের বিষয় যে, ইদানীং মুসলমানদের মধ্য থেকেও এই রীতি-পদ্ধতি শেষ হয়ে যাচ্ছে। একে তো অনৈসলামিক নাম রাখা হয়ই, তদুপরি দৈবাৎ কোন পিতা-মাতা ইসলামী নাম রাখলেও সেগুলোতে কোন ইংরেজী বর্ণ যোগে সংক্ষেপিত করে তার স্বকীয়তাকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। আকার-আকৃতি দেখে একজনকে মুসলমান বলে মনে করার বিষয়টি তো ইতিপূর্বেই দুষ্কর হয়ে পড়েছিল, নামের এই নয়া পদ্ধতির প্রচলন হওয়ায় মুসলমানিত্বের বাদবাকি লক্ষণটিও বিদায় হয়ে গেছে। আল্লাহ্ আমাদের দীনের জ্ঞান এবং ইসলামের মহব্বত দান করুন।—আমীন।

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٩٤﴾ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ
بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ
لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ
فَلَا تُنظِرُونِ ﴿١٩٥﴾ إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى
الصَّالِحِينَ ﴿١٩٦﴾ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ
نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿١٩٧﴾ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ
لَا يَسْمَعُوا ۖ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٩٨﴾

(১৯৪) আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা সবাই তোমাদের মতই বান্দা। অতএব তোমরা যখন তাদেরকে ডাক, তখন তাদের পক্ষেও তো তোমাদের সে ডাক কবূল করা উচিত—যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক? (১৯৫) তাদের কি পা আছে, যদ্দ্বারা তারা চলাফেরা করে, কিংবা তাদের কি হাত আছে, যদ্দ্বারা তারা ধরে। অথবা তাদের কি চোখ আছে যদ্দ্বারা তারা দেখতে পায় কিংবা তাদের কি কান আছে যদ্দ্বারা তারা শুনতে পায়? বলে দাও তোমরা ডাক তোমাদের অংশীদারদের, অতপর আমার অমঙ্গল কর এবং আমাকে অবকাশ দিও না। (১৯৬) আমার সহায় তো হলেন আল্লাহ্, যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। বস্তুত তিনিই সাহায্য করেন সৎকর্মশীল বান্দাদের। (১৯৭) আর তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে, যাদেরকে ডাক—তারা না তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারবে, না নিজেদের আত্মরক্ষা করতে পারবে। (১৯৮) আর তুমি যদি তাদেরকে সুপথে আহবান কর তবে তারা তা কিছুই শুনবে না। আর তুমি তো তাদেরকে দেখছই তোমার দিকে তাকিয়ে আছে অথচ তারা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যা হোক, বস্তুতই) তোমরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যাদের উপাসনা করছ, তারাও তোমাদেরই মত (আল্লাহ্‌র অধিকারভুক্ত) গোলাম (অর্থাৎ তোমাদের চেয়ে বড় বা বিশেষ কিছু নয়; বরং নিকৃষ্টও হতে পারে।) কাজেই (আমরা তোমাদের তখনই

সত্যবাদী বলে মেনে নেব) যখন তোমরা তাদের ডাকবে, অতপর তোমাদের প্রার্থনা অনুযায়ী তারাও তোমাদের কার্য সম্পাদন করে দেবে। যদি তোমরা (তাদেরকে প্রভু হিসাবে বিশ্বাস করার ব্যাপারে) সত্য হয়ে থাক। (পক্ষান্তরে তারা তোমাদের আবেদন কি পূরণ করবে? কথা বা দাবি পূরণ করার জন্য যেসব উপকরণের প্রয়োজন, তাও যে তাদের নেই। দেখেই নাও) তাদের কি কোন পা আছে, যাতে করে তারা চলতে পারে? কিংবা তাদের কি কোন হাত আছে, যাতে তারা কোন জিনিস ধরতে পারে? অথবা তাদের কি চোখ আছে, যাতে তারা দেখবে? কিংবা তাদের কি কোন কান আছে, যাতে তারা শুনবে? (তাদের মধ্যে যখন কোন কারিকাশক্তিই নেই, তখন তাদের দ্বারা কোন কাজ কেমন করে সংঘটিত হবে? আর) আপনি (এ কথাও) বলে দিন যে, (যেভাবে তারা নিজের ভক্তবৃন্দের কোন প্রকার উপকার সাধনে অপারক, তেমনি-ভাবে তারা নিজেদের বিরোধীদের ক্ষতিসাধনেও অপারক—যেমন তোমরা বলে থাক যে, "আমাদের দেব-দেবীদের বেআদবী করো না, তাহলে তারা তোমাদের উপর কোন অকল্যাণ অবতীর্ণ করবে।" এ বিষয়টি 'লুবাব্' গ্রন্থে يُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আবদুর রাযযাক থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। আর যদি তোমরা মনে কর যে, এরা আমার কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে, তাহলে) তোমরা (তোমাদের বাসনা চরিতার্থ কর এবং) নিজেদের সমস্ত শরীকদের ডেকে আন (এবং) অতপর সবাই মিলে আমার ক্ষতিসাধনের চেষ্টা-তদবীর কর। তারপর (যখন তোমাদের সে প্রচেষ্টা সম্পাদিত হবে, তখন) আর আমাকে মুহূর্তের অবকাশও দিও না, (বরং সাথে সাথে আমার উপর তা বাস্তবায়িত করো ঃ দেখি তাতে কি হয়। বস্তুত ছাইও হবে না। কারণ, সেসব শরীক বা অংশীদার তো একেবারেই বেকার। অবশ্য তোমরা যারা হাত-পা নাড়াচাড়া করতে পার; তোমরাও আমার কিছুই করতে পারবে না এ জন্য যে,) নিশ্চিত আমার সহায় হলেন আল্লাহ্ তা'আলা। (তাঁর প্রকাশ্য সহায়-সঙ্গী হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, তিনি আমার উপর) এ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন (যা অতি পবিত্র এবং ইহ-পরকালের জন্য ব্যাপক। তাছাড়া তিনি যদি আমার সহায়-সঙ্গীই না হবেন, তবে এমন মহান নিয়ামত কেন দান করবেন!) আর (এই বিশেষ প্রমাণ ছাড়াও একটি সাধারণ নিয়মও রয়েছে যাতে তাঁর সাহায্যকারী হওয়া বোঝা যায়। তা হল এই যে,) তিনি (সাধারণত) সৎকর্মশীল বান্দাদের সাহায্য করে থাকেন। (বস্তুত নবী-রসূলরা হচ্ছেন নেক বান্দাদের মধ্যে পরিপূর্ণ পুরুষ। আর আমিও যখন একজন নবী, তখন আমাকেও অবশ্যই তিনি সাহায্য করবেন।

সুতরাং সারকথা হল এই যে, তোমরা আমাকে যাদের অমঙ্গলের ভয় দেখাও তারা হল অক্ষম। আর যিনি আমাকে যাবতীয় অকল্যাণ-অমঙ্গল থেকে রক্ষা করেন তিনি হলেন অসীম ক্ষমতার অধিকারী। কাজেই আশংকা কিসের?) আর (তাদের অক্ষমতা যথার্থভাবে প্রমাণিত হলেও যেহেতু সে ক্ষেত্রে অক্ষমতা বর্ণনার উদ্দেশ্য ছিল

অন্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত, এবং সেখানে মূল উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্‌র অধিকারকে খণ্ডন করা, কাজেই পরবর্তীতে উদ্দেশ্যমূলকভাবেই অক্ষমতার বর্ণনা করেছেন যে,) তোমরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যাদের (উপাস্য সাব্যস্ত করে) উপাসনা করছ তারা (তোমাদের শত্রুদের মুকাবিলায়—যেমন আমি রয়েছি) তোমাদের কোনই সাহায্য করতে পারবে না এবং তাদের (নিজেদের জন্য আমার মত শত্রুর মুকাবিলায়) নিজেদেরও কোন সাহায্য করতে পারবে না। (সাহায্য করা তো অনেক বড় কথা,) তাদের যদি কোন বিষয় বলার জন্য আহবান করা হয়, তবে তাও তারা শুনতে পারবে না। (এর অর্থও দু'রকম হতে পারে।) আর (তাদের কাছে যেমন কোনার উপকরণ নেই, তেমনি নেই দেখার উপকরণও। তবে তাদের মূর্তি নির্মাণ করতে গিয়ে যে চোখ বানিয়ে দেওয়া হয়, সেগুলো হলো নামের চোখ, কাজের নয়। অতএব) সে মূর্তিগুলোকে আপনি যখন দেখেন, তখন মনে হবে, যেন তারাও আপনাকে দেখছে। (কারণ, সেগুলোর আকার যে চোখেরই মত হয়ে থাকে।) কিন্তু (প্রকৃতপক্ষে) তারা কিছুই দেখে না (কাজেই এহেন অক্ষমের ভয় কি দেখাও)!

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ

এখানে 'ওলী' অর্থ রক্ষাকারী; সাহায্যকারী। আর 'কিতাব' অর্থ কোরআন। 'সালেহীন' অর্থ হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর ভাষায় সেই সমস্ত লোক, যাঁরা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে সমান করে না। এতে নবী-রসূল থেকে শুরু করে সাধারণ সৎকর্মশীল মুসলমান পর্যন্ত সবাই অন্তর্ভুক্ত।

বস্তুত আয়াতের অর্থ হল এই যে, তোমাদের বিরোধিতার কোন ভয় আমার এ কারণে নেই যে, আমার রক্ষাকারী ও সাহায্যকারী হলেন আল্লাহ্, যিনি আমার উপর কোরআন অবতীর্ণ করেছেন।

এখানে আল্লাহ্ তা'আলার সমস্ত গুণের মধ্যে বিশেষভাবে কোরআন অবতীর্ণ করার গুণটি উল্লেখ করা হয়েছে এজন্য যে, তোমরা যে আমার শত্রুতা ও বিরোধিতায় বদ্ধপরিকর হয়ে আছ তার কারণ হচ্ছে যে, আমি তোমাদের কোরআনের শিক্ষা দিই এবং কোরআনের প্রতি আহবান করি। কাজেই যিনি আমার উপর কোরআন নাযিল করেছেন, তিনিই আমার সাহায্যদাতা ও রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব আমার কি চিন্তা?

অতপর আয়াতের শেষ বাক্যটিতে একটি সাধারণ নিয়ম বাতলে দেয়া হয়েছে যে, নবী-রসূলদের মর্যাদা তো বহু ঊর্ধ্বে, সাধারণ সৎ মুসলমানদের জন্যও আল্লাহ্ সহায় ও রক্ষাকারী। তিনি তাদের সাহায্য করেন বলেই কোন শত্রুর শত্রুতা তাদের ক্ষতিসাধন করতে পারে না। অধিকাংশ সময় এ পৃথিবীতেই তাদেরকে শত্রুর উপর

জয়ী করে দেয়া হয়। আর যদি কখনও কোন বিশেষ তাৎপর্যের কারণে তাৎক্ষণিক বিজয় দান করা নাও হয়, তাতে বিজয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্যের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। তারা বাহ্যিক অকৃতকার্যতা সত্ত্বেও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে কৃতকার্য হয়ে থাকেন। কারণ, সৎকর্মশীল মু'মিনের প্রতিটি কাজ হয় আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টিরই উদ্দেশ্যে নিবেদিত। তাঁর আনুগত্যের জন্য। কাজেই তারা যদি কোন কারণে পার্থিব জীবনে অকৃতকার্যও হয়, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির ক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্য লাভে কৃতকার্য হয়ে থাকে। বস্তুত এটাই হল সত্যিকার কৃতকার্যতা।

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ۝١٩٩ وَإِمَّا
يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۚ إِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝٢٠٠
إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَإِذَا
هُمْ مُّبْصِرُوْنَ ۝٢٠١ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُوْنَ ۝٢٠٢

(১৯৯) আর ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তোল, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খ-জাহিলদের থেকে দূরে সরে থাক। (২০০) আর যদি শয়তানের প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে আল্লাহ্র শরণাপন্ন হও। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। (২০১) যাদের মনে ভয় রয়েছে, তাদের উপর শয়তানের আগমন ঘটার সাথে সাথেই তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং তখনই তাদের বিবেচনাশক্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে। (২০২) পক্ষান্তরে যারা শয়তানের ভাই, তাদেরকে সে ক্রমাগত পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়। অতপর তাতে কোন কমতি করে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(মানুষের সাথে আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে) সাধারণ দৃষ্টিতে (তাদের আমল-আখলাকের মধ্যে) যে আচরণ (যুক্তিসংগত ও সংগত বলে মনে হয়, সেগুলো) গ্রহণ করে নেবেন। (সেগুলোর নিগূঢ় তত্ত্ব-তথ্য অনুসন্ধান করতে যাবেন না। বরং বাহ্যিক ও সাধারণ দৃষ্টিতে কারও পক্ষ থেকে ভাল কোন কাজ অনুষ্ঠিত হলে তাকে কল্যাণকর বলেই আখ্যায়িত করুন। আর আভ্যন্তরীণ বিষয় আল্লাহ্র উপর ছেড়ে দিন। কারণ, সত্যিকার নিঃস্বার্থতা এবং তদুপরি আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ার যাবতীয় শর্ত পরিপূর্ণভাবে পালন করতে পারা অতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যাপার। সারকথা হল এই যে, সামাজিক আচার-আচরণের ব্যাপারে সহজ হোন, কড়াকড়ি করবেন না। এ সমস্ত

আচার-আচরণ তো গেল ভাল ও সৎকাজের ব্যাপারে।) আর (যেসব কাজ বাহ্যিক দৃষ্টিতেও মন্দ, সেগুলোর ব্যাপারে আপনার আচরণ হবে এই যে,) আপনি সৎকাজের শিক্ষা দিয়ে দেবেন (এবং কঠিনভাবে সেগুলোর পেছনে পড়বেন না।) আর যদি (কখনও ঘটনাচক্রে তাদের মূর্খতার দরুন) শয়তানের পক্ষ থেকে আপনার মনে (রাগ করার) প্ররোচনা আসতে আরম্ভ করে (যাতে কল্যাণবিরুদ্ধ কোন কথা বেরিয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে,) তবে (এমতাবস্থায় সাথে সাথে) আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হবেন। নিঃসন্দেহে তিনি শ্রবণকারী এবং যথেষ্ট পরিমাণে অবগত। (তিনি আপনার শরণবিষয়ক প্রার্থনা শোনেন, আপনার উদ্দেশ্যের বিষয় জানেন। তিনি আপনাকে তা থেকে আশ্রয় দান করবেন এবং শরণাপন্ন হওয়া ও তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করা যেমন আপনার জন্য কল্যাণকর তেমনিভাবে সমস্ত আল্লাহ্‌ভীরু লোকদের জন্যও তা কল্যাণকর। সুতরাং এ কথা একান্ত) নিশ্চিত যে, যে সমস্ত লোক আল্লাহ্‌ভীরু তাদের জন্য (রাগ-রোষ কিংবা অন্য কোন বিষয়) যখন শয়তানের পক্ষ থেকে কোন শঙ্কা দেখা দেয়, তখন (সঙ্গে সঙ্গে) তারা (আল্লাহ্‌কে) স্মরণ করতে আরম্ভ করে। যেমন আশ্রয় প্রার্থনা, দোয়া করা, আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ব, তাঁর আযাব ও সওয়াব প্রভৃতির স্মরণ করা। সুতরাং সহসাই তাদের দৃষ্টি খুলে যায় (এবং বিষয়ের তাৎপর্য তাদের সামনে পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে, যার ফলে সে আশঙ্কা কার্যকর হতে পারে না।) আর (এরই বিপরীতে যারা শয়তানের দোসর সে (অর্থাৎ, শয়তান) তাদেরকে গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার প্রতি টানতে থাকে, আর তারা (এই পথভ্রষ্টতার অনুগমন) থেকে ফিরে আসতে পারে না। (না তারা আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারে, না নিরাপদ থাকতে পারে। কাজেই এই মুশরিকরা যখন শয়তানের অনুগত, তখন কেমন করে এরা ফিরে আসবে? সুতরাং তাদের প্রতি রাগান্বিত হওয়া নিরর্থক)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কোরআনী চরিত্রের একটি ব্যাপক হেদায়েতনামা ঃ আলোচ্য আয়াতগুলো কোরআনী চরিত্র দর্শনের এক অনন্য ও ব্যাপক হেদায়েতনামাস্বরূপ। এর মাধ্যমে রসূলে করীম (সা)-কে প্রশিক্ষণ দান করে তাঁকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত সৃষ্টির মাঝে 'মহান চরিত্রবান' খেতাবে ভূষিত করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইসলামের শত্রুদের মন্দ চালচলন, হঠকারিতা ও অসচ্চরিত্রতার আলোচনার পর আলোচ্য এই আয়াতগুলোতে তার বিপরীতে মহানবী (সা)-কে সর্বোত্তম চরিত্রের হেদায়েত দেওয়া হয়েছে। তাতে তিনটি বাক্য রয়েছে। প্রথম বাক্য خُذِ الْعَفْوَ। আরবী অভিধান মোতাবেক عَفْوٌ (আফ্‌বুন)-এর অর্থ একাধিক হতে পারে এবং একত্রে সবক'টি অর্থই প্রযোজ্য হতে পারে। সে কারণেই তফসীরবিদ আলিমদের বিভিন্ন দল বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করেছেন। অধিকাংশ তফসীরকার যে অর্থ

নিয়েছেন তা হল এই যে, عفو বলা হয় এমন প্রত্যেকটি কাজকে, যা সহজে কোন রকম আয়াস ব্যতিরেকে সম্পন্ন হতে পারে। তাহলে বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আপনি এমন বিষয় গ্রহণ করে নিন, যা মানুষ অনায়াসে করতে পারে। অর্থাৎ শরীয়ত নির্ধারিত কর্তব্য সম্পাদনে আপনি সাধারণ মানুষের কাছে সুউচ্চমান দাবি করবেন না; বরং তারা সহজে যে পরিমাণ আমল করতে পারে আপনি তাই গ্রহণ করে নিন। যেমন, নামাযের প্রকৃত রূপ হচ্ছে এই যে, বান্দা সমগ্র দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন ও একাগ্র হয়ে আপন পালনকর্তার সামনে হাত বেঁধে এমনভাবে দাঁড়াবে, যেন আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণনার মাধ্যমে নিজের আবেদনসমূহ কোন প্রকার মাধ্যম ব্যতীত তাঁর দরবারে সরাসরি পেশ করছে। তখন সে যেন সরাসরি আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের সাথে কথোপকথন করছে। এজন্য যে বিনয়, নম্রতা, রীতি-পদ্ধতি ও সম্মানবোধের প্রয়োজন, তা যে লাখো নামাযীর মধ্যে বিরল বান্দাদের ভাগ্যেই জোটে, তা বলাই বাহুল্য। সাধারণ মানুষ এ স্তর লাভ করতে পারে না। অতএব, এ আয়াতে রসূলে করীম (সা)-কে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, আপনি সেসব লোকের কাছে এমন সুউচ্চ স্তরের প্রত্যাশাই করবেন না। বরং যে স্তর তারা সহজে ও অনায়াসে লাভ করতে পারে, তাই গ্রহণ করে নিন। তেমনিভাবে অন্যান্য ইবাদত—যাকাত, রোযা, হজ্ব এবং সাধারণ আচার-আচরণ ও সামাজিক ব্যাপারে শরীয়ত নির্ধারিত কর্তব্যসমূহ যারা পরিপূর্ণভাবে সম্পাদন করতে পারে না, তাদের কাছ থেকে সেটুকুই কবুল করে নেয়া বান্ছনীয়, যা তারা অনায়াসে করতে পারে।

সহীহ্ বুখারী শরীফেও হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবাইর (রা)-এর উদ্ধৃতিতে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) হতে উল্লেখিত আয়াতের এই অর্থই বর্ণনা করা হয়েছে।

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, এ আয়াতটি নাযিল হলে হুযুর (সা) বললেন, আল্লাহ্ আমাকে মানুষের আমল-আখলাকের ব্যাপারে সাধারণ আনুগত্য কবুল করে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছি যে, যে পর্যন্ত আমি তাদের মাঝে থাকব এমনি করব।—(ইবনে কাসীর)

তফসীরশাস্ত্রের ইমামদের এক বিরাট জমাত, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবাইর, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এবং মুজাহিদ প্রমুখও এ বাক্যটির উল্লেখিত অর্থই সাব্যস্ত করেছেন।

عفو -এর অপর অর্থ ক্ষমা করা এবং অব্যাহতি দেয়াও হয়ে থাকে। তফসীরকার আলিমদের একদল এ ক্ষেত্রে এ অর্থেই বাক্যটির মর্ম সাব্যস্ত করেছেন এই যে, আপনি পাপী-তাপীদের অপরাধ ক্ষমা করে দিন।

তফসীরশাস্ত্রের ইমাম ইবনে জরীর (র) উদ্ধৃত করেছেন যে, এ আয়াতটি যখন নাযিল হয়, তখন মহানবী (সা) হযরত জিবরাঈল আমীনকে এর মর্ম জিজ্ঞেস করেন।

অতপর হযরত জিবরাঈল স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে জেনে নিয়ে মহানবী (সা)-কে জানান যে, এ আয়াতে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন আপনাকে [অর্থাৎ হুযুর (সা)-কে] নির্দেশ দিচ্ছেন যে, কেউ যদি আপনার প্রতি অন্যায়-অবিচার করে, তবে আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন। যে আপনাকে কিছুই দেয় না, তাকে আপনি দান করুন এবং যে আপনার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আপনি তার সাথেও মেলামেশা করুন।

এ প্রসঙ্গে ইবনে মারদুবিয়াহ্ (র) সা'দ ইবনে উবাদাহ্ (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, গয্ওয়ায়ে ওহুদের সময় যখন হুযূর (সা)-এর চাচা হযরত হামযা (রা)-কে শহীদ করা হয় এবং অত্যন্ত নৃশংসভাবে তাঁর শরীরের অংগ-প্রত্যঙ্গ কেটে লাশের প্রতি চরম অসম্মানজনক আচরণ করা হয়, তখন মহানবী (সা) লাশটিকে সে অবস্থায় দেখতে পেয়ে বললেন, যারা হামযা (রা)-র সাথে এহেন আচরণ করেছে, আমি তাদের সত্তর জনের সাথে এমনি আচরণ করে ছাড়ব। এরই প্রেক্ষিতে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং এতে হুযূর (সা)-কে বাতলে দেয়া হয় যে, এটা আপনার মর্যাদাসম্পন্ন নয়; বরং আপনার মর্যাদার উপযোগী হলো ক্ষমা ও অব্যাহতি দান করা।

এ বিষয়ের সমর্থন সে হাদীসেও পাওয়া যায়, যাতে ইমাম আহমদ উকবাহ্ (র) ইবনে আমের (রা)-এর রেওয়ায়েত থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, তাঁদেরকে অর্থাৎ সাহাবী-দের মহানবী (সা) যে মহান চরিত্রের প্রশিক্ষণ দান করেছেন তা ছিল এই যে, তোমরা সে লোককে ক্ষমা করে দাও, যে তোমাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করে, যে লোক তোমা-দের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে, তোমরা তার সাথে মেলামেশা করতে থাক এবং যে লোক তোমাদের বঞ্চিত করে, তাকে দান-খয়রাত কর।

হযরত আলী (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে ইমাম বায়হাকী (র) উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, আমি তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের স্বভাব-চরিত্র অপেক্ষা উত্তম স্বভাব ও চরিত্রের শিক্ষা দিচ্ছি। তা হল এই যে, যে লোক তোমাদের বঞ্চিত করে, তোমরা তাকে দান কর, যে লোক তোমাদের প্রতি অত্যাচার-উৎপীড়ন করে, তোমরা তাকে ক্ষমা করে দাও; যে তোমাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে তোমরা তার সাথে মেলামেশা কর।

عَفْو — শব্দের প্রথম ও দ্বিতীয় অর্থের মধ্যে যদিও পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু উভয় অর্থের মূল বক্তব্যই এক। তাহল এই যে, মানুষের হালকা ও অগভীর আনুগত্য ও ফরমাঁবর-দারীকেই গ্রহণ করে নিন; অধিকতর যাচাই-অনুসন্ধানের পেছনে পড়বেন না এবং তাদের কাছ থেকে অতি উচ্চস্তরের আনুগত্যও কামনা করবেন না। তাছাড়া তাদের ভুল-ভ্রান্তিসমূহ ক্ষমা করে দিন। অত্যাচারের প্রতিশোধ অত্যাচারের মাধ্যমে গ্রহণ করতে যাবেন না। সুতরাং মহানবী (সা)-র কাজকর্ম ও মহান স্বভাব সর্বদা এ ছাঁচেই ঢেলে সাজানো ছিল। আর তারই বিকাশ ঘটেছিল সে সময় যখন মক্কা বিজয়ের সাথে সাথে তাঁর প্রাণের শত্রুরা তাঁর হাতের মুঠোয় এসে হাযির হয়েছিল। তখন তিনি তাদের

সবাইকে মুক্ত করে দিয়ে বলেছিলেন, তোমাদের অত্যাচার-উৎপীড়নের প্রতিশোধ তো দূরের কথা, আজ আমি তোমাদের বিগত দিনের আচার-ব্যবহারের জন্য তোমাদের ভর্ৎসনাও করছি না।

আলোচ্য হেদায়েতনামার দ্বিতীয় বাক্যটি হল ঃ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

অর্থে عُرْف বলা হয় যেকোন ভাল ও প্রশংসনীয় কাজকে। অর্থাৎ যেসব লোক আপনার সাথে মন্দ ও উৎপীড়নমূলক আচরণ করে, আপনি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন না; বরং তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। কিন্তু সেই সাথে তাদেরকে সৎকাজেরও উপদেশ দিতে থাকুন। অর্থাৎ অসদাচরণের বিনিময় সদাচরণ এবং অত্যাচারের বিনিময় শুধুমাত্র ন্যায়নীতির মাধ্যমেই নয়; বরং অনুগ্রহের মাধ্যমে দান করুন।

তৃতীয় বাক্যটি হল وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ-এর অর্থ হল এই যে, যারা জাহেল বা মূর্খ তাদের কাছ থেকে আপনি দূরে সরে থাকুন। মর্মার্থ এই যে, আপনি অত্যাচারের প্রতিশোধ না নিয়ে তাদের সাথে কল্যাণকর ও সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করুন এবং একান্ত কোমলতার সাথে তাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের বিষয় বাতলে দিন। কিন্তু বহু মূর্খ এমনও থাকে যারা এহেন ভদ্রোচিত আচরণে প্রভাবিত হয় না; বরং এমতাবস্থায়ও তারা মূর্খজনোচিত রূঢ় ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়। এমন ধরনের লোকদের সাথে আপনার আচরণ হবে এই যে, তাদের হৃদয়বিদারক মূর্খজনোচিত কথা-বার্তায় দুঃখিত হয়ে তাদেরই মত ব্যবহার আপনিও করবেন না; বরং তাদের থেকে দূরে সরে থাকবেন।

তফসীরশাস্ত্রের ইমাম ইবনে কাসীর (র) বলেন যে, দূরে সরে থাকার অর্থও মন্দের প্রত্যুত্তরে মন্দ ব্যবহার না করা। এর অর্থ এই নয় যে, তাদের হিদায়েতও বর্জন করতে হবে। কারণ, এটা রিসালত ও নবুয়তের দায়িত্ব এবং মর্যাদার যোগ্য নয়।

সহীহ্ বুখারীতে এক্ষেত্রে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত একটি ঘটনা উদ্ধৃত করা হয়েছে। তা হল এই যে, হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর খিলাফত আমলে উয়ায়নাহ্ ইবনে হিসন একবার মদীনায় আসে এবং স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র হুর ইবনে কায়েসের মেহমান হয়। হুর ইবনে কায়েস ছিলেন সেই সমস্ত বিজ্ঞ আলিমের একজন, যাঁরা হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণ করতেন। উয়ায়নাহ্ স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র হুরকে বলল; তুমি তো আমীরুল মু'মিনীনের একজন অতি ঘনিষ্ঠ লোক; আমার জন্য তাঁর সাথে সাক্ষাতের একটা সময় নিয়ে এসো। হুর ইবনে কায়েস (রা) ফারূকে আযম (রা)-এর নিকট নিবেদন করলেন যে, আমার চাচা উয়ায়নাহ্ আপনার সাথে সাক্ষাত করতে চান। তখন তিনি অনুমতি দিয়ে দিলেন।

কিন্তু উয়ায়নাহ্ ফারূকে আযম (রা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়েই একান্ত অমার্জিত ও ভ্রান্ত কথাবার্তা বলতে লাগল যে, "আপনি আমাদেরকে না দেন আমাদের ন্যায্য অধিকার,

না করেন আমাদের সাথে ন্যায় ও ইনসাফের আচরণ।" হযরত ফারূকে আযম (রা) তাঁর এসব কথা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে হুর ইবনে কায়েস নিবেদন করলেন, ইয়া আমীরুল মু'মিনীন, "আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেছেন ঃ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ আর এ লোকটিও জাহিলদের একজন।" এই আয়াতটি শোনার সাথে সাথে হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর সমস্ত রাগ শেষ হয়ে গেল এবং তাকে কোন কিছুই বললেন না। হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর ব্যাপারে প্রসিদ্ধি ছিল كَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ অর্থাৎ আল্লাহ্র কিতাবে বর্ণিত হুকুমের সামনে তিনি ছিলেন উৎসর্গিত প্রাণ।

যা হোক, এ আয়াতটি বলিষ্ঠ ও সচ্চারিত্রিকতা সম্পর্কে একটি অতি ব্যাপক আয়াত। কোন কোন আলিম এর সারমর্ম বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, মানুষ দু'রকম। (এক) সৎকর্মশীল এবং (দুই) অসৎকর্মশীল। এই আয়াত উভয় শ্রেণীর সাথেই সদ্ব্যবহার করার হিদায়েত দিয়েছে যে, যারা নেক কাজ করে, তাদের বাহ্যিক নেকীকে কবুল করে নাও, তাদের ব্যাপারে বেশি তদন্ত অনুসন্ধান করতে যেও না কিংবা অতি উচ্চমানের সৎকর্ম তাদের কাছে দাবি করো না; বরং যতটুকু সৎকর্ম তারা সহজভাবে করতে পারে, তাকেই যথেষ্ট বলে বিবেচনা করো। আর যারা বদ্কার বা অসৎকর্মী তাদের ব্যাপারে এ আয়াতের হিদায়েত হলো এই যে, তাদেরকে সৎকাজের শিক্ষাদান কর এবং কল্যাণের পথ প্রদর্শন করতে থাক। যদি তারা তা গ্রহণ না করে নিজেদের গোমরাহী ও ভ্রান্তিতে আঁকড়ে থাকে এবং মূর্খজনোচিত কথাবার্তা বলতে থাকে, তবে তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাও এবং তাদের সেসব মূর্খতাসুলভ কথার কোন উত্তরই দেবে না। এতে হয়তোবা কখনও তাদের চেতনার উদয় হবে এবং নিজেদের ভুল থেকে ফিরে আসতে পারে।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ অর্থাৎ আপনার মনে যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোন ওয়াস্-ওয়াসা আসতে আরম্ভ করে, তাহলে আপনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবেন। তিনি শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত।

প্রকৃতপক্ষে এ আয়াতটিও পূর্ববর্তী আয়াতের উপসংহার। কারণ, এতে হিদায়েত দেওয়া হয়েছে যে, যারা অত্যাচার-উৎপীড়ন করে এবং মূর্খজনোচিত ব্যবহার

করে, তাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন। তাদের মন্দের উত্তর মন্দের দ্বারা দেবেন না। এ বিষয়টি মানবপ্রকৃতির পক্ষে একান্তই কঠিন। বিশেষত এমন পরিস্থিতিতে সৎ এবং ভাল মানুষদেরকেও শয়তান রাগান্বিত করে লড়াই-ঝগড়ায় প্রবৃত্ত করেই ছাড়ে। সেজন্যই পরবর্তী আয়াতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যদি এহেন মুহূর্তে রোষানল জ্বলে উঠতে দেখা যায়, তবে বুঝবে শয়তানের পক্ষ থেকেই এমনটি হচ্ছে এবং তার প্রতিকার হল আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ্ চাওয়া, তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করা।

হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, দু'জন লোক মহানবী (সা)-র সামনে ঝগড়া-বিবাদ করছিল। এদের একজন রাগে হিতাহিত জ্ঞান হারাবার উপক্রম হয়ে পড়েছিল। এ অবস্থা দেখে হুযূর (সা) বললেন, 'আমি একটি বাক্য জানি, যদি এ লোকটি সে বাক্য উচ্চারণ করে, তাহলে তার এই উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে যাবে। তারপর বললেন, বাক্যটি হল এই : "أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ" সে লোক হুযূর (সা)-এর কাছে শুনে সঙ্গে সঙ্গে বাক্যটি উচ্চারণ করল। তাতে সাথে সাথে তার রোষানল প্রশমিত হয়ে গেল।

বিস্ময়কর উপকারিতা

তফসীরশাস্ত্রের ইমাম ইবনে কাসীর (র) এ প্রসঙ্গে এক আশ্চর্য বিষয় উল্লেখ করেছেন। তা হল এই যে, সমগ্র কোরআন মজীদে বলিষ্ঠ ও উচ্চতর চারিত্রিক শিক্ষা-দানকল্পে তিনটি ব্যাপকভিত্তিক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এবং এ তিনটির শেষেই শয়তান থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে পানাহ্ চাওয়ার কথা বলা হয়েছে। তার একটি হল, সূরা আ'রাফের আলোচ্য আয়াত, দ্বিতীয়টি সূরা মু'মিনুনের আয়াত : اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ অর্থাৎ "অকল্যাণকে কল্যাণের দ্বারা প্রতিহত কর। আমি ভাল করেই জানি, যা কিছু তারা বলে থাকে। আর আপনি এভাবে দোয়া করুন যে, হে আমার পরওয়ারদিগার, আমি আপনার নিকট শয়তানের প্ররোচনার চাপ থেকে আশ্রয় কামনা করি। আর হে আমার পালনকর্তা, শয়তান আমার নিকট আসবে—আমি এ ব্যাপারেও আপনার নিকট পানাহ্ চাই।"

তৃতীয় সূরা হা-মীম-সাজ্‌দার আয়াত :

وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ـ اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ

فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝ وَمَا يُلَقَّاهَا
إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ۝ وَإِمَّا
يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ۝

অর্থাৎ নেকী আর বদী, ভাল ও মন্দ সমান হয় না। আপনি নেকীর মাধ্যমে বদী প্রতিহত করুন। তাহলে আপনার মধ্যে এবং যে লোকের মধ্যে শত্রুতা বিদ্যমান সহসাই সে এমন হয়ে যাবে, যেমন হয় একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। আর এ বিষয়টি সে সমস্ত লোকের ভাগ্যেই জোটে, যারা একান্ত স্থিরচিত্ত হয়ে থাকে এবং বিষয়টি যারই ভাগ্যে জোটে সে লোক বড়ই ভাগ্যবান। আর যদি শয়তানের পক্ষ থেকে আপনার মনে কোন রকম সংশয় বা ওয়াস্‌ওয়াসা আসতে আরম্ভ করে, তবে আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ চেয়ে নিন। নিঃসন্দেহে তিনি সর্বশ্রোতা এবং অত্যন্ত জ্ঞানী।

এই তিনটি আয়াতেই সেসব লোকের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন এবং মন্দের বিনিময় কল্যাণের মাধ্যমে দেয়ার হিদায়েত দেয়া হয়েছে, যাদের আচরণ রাগের সঞ্চার করে। আর সাথে সাথে শয়তানের প্রতারণা থেকে পানাহ চাওয়ার কথাও বলা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের ঝগড়া-বিবাদের সাথে শয়তানেরও একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। যেখানেই বিবাদ-বিসংবাদের সুযোগ দেখা দেয়, শয়তান সে স্থানটিকে নিজের রণক্ষেত্র বানিয়ে নেয় এবং বিরাট বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোককেও ক্রোধান্বিত করে সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত করতে প্রয়াস পায়।

এর প্রতিকার এই যে, যখন দেখবে—রাগ প্রশমিত হচ্ছে না, তখন বুঝবে শয়তান আমার উপর জয়ী হয়ে যাচ্ছে এবং তখনই আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করে তাঁর কাছে পানাহ্ চাইবে। তবেই চারিত্রিক বলিষ্ঠতা অর্জিত হবে। সে জন্যই পরবর্তী তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতেও শয়তান থেকে পানাহ্ চাওয়ার হিদায়েত দেওয়া হয়েছে।

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ
مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي ۚ هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى
وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ
وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

(২০৩) আর যখন আপনি তাদের নিকট কোন নিদর্শন নিয়ে না যান, তখন তারা বলে, আপনি নিজের পক্ষ থেকে কেন অমুকটি নিয়ে আসলেন না, তখন আপনি বলে দিন আমি তো সে মতেই চলি যে হুকুম আমার নিকট আসে আমার পরওয়ারদিগারের কাছ থেকে। এটা ভাববার বিষয় তোমাদের পরওয়ারদিগারের পক্ষ থেকে এবং হিদায়েত ও রহমত সেই সব লোকের জন্য যারা ঈমান এনেছে। (২০৪) আর যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তখন তাতে কান লাগিয়ে রাখ এবং নিশ্চুপ থাক যাতে তোমাদের উপর রহমত হয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর যখন আপনি (তাদের শত্রুতাসুলভ ফরমায়েশী মু'জিযাসমূহের মধ্য থেকে) কোন মু'জিযা তাদের সামনে প্রকাশ করেন না (এ কারণে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ রহস্যের ভিত্তিতে সে মু'জিযা সৃষ্টিই করেননি) তখন তারা (রিসালতকে অস্বীকার করার মানসে আপনাকে) বলে যে, আপনি (যদি নবীই হয়ে থাকেন, তবে) অমুক অমুক মু'জিযা (প্রকাশ করার জন্য) কেন নিয়ে এলেন না! আপনি বলে দিন, (নিজের ইচ্ছায় কোন মু'জিযা নিয়ে আসাটা আমার কাজ নয়। বরং আমার প্রকৃত কাজ হল এই যে,) আমি তারই অনুসরণ করি যা আমার উপর আমার পরওয়ারদিগারের পক্ষ থেকে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। (এতে তবলীগও অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। অবশ্য নবুয়ত প্রমাণ করার জন্য মু'জিযা অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। কাজেই তার আগমনও ঘটেছে। বস্তুত এগুলোর মধ্যে সবচাইতে বড় একটি মু'জিযা হল স্বয়ং এই কোরআন, যার গৌরব এই যে,) এটা (নিজেই যেন) তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে বহু দলীলস্বরূপ। (কারণ, প্রতিটি সূরা পরিমাণ অংশই একেকটা মু'জিযা। কাজেই এই হিসাবে সমগ্র কোরআন যে বহু দলীল তা একান্ত যুক্তিসঙ্গত ও স্বতঃসিদ্ধ বিষয়।) আর (এর বাস্তব ও কার্যকর উপকারিতা হল বিশেষভাবে তাদের জন্য যারা একে মানে। সুতরাং এটা) হেদায়েত ও রহমত প্রাপ্ত সেই সমস্ত লোকের জন্য যারা (এর উপর) ঈমান এনেছে। আর (আপনি তাদেরকে এ কথাও বলে দিন,) যখন কোরআন পাঠ করা হয় [উদাহরণত রসূলে করীম (সা) যখন এর তবলীগ বা প্রচার করেন], তখন তার প্রতি কান লাগিয়ে রাখ এবং নীরব থাক (যাতে এর মু'জিযা হওয়ার বিষয়টি এবং এর শিক্ষাকে যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করে নিতে পার—), তাহলেই আশা করা যায়, তোমাদের উপর (নতুন নতুন ও অধিক পরিমাণে) রহমত বর্ষিত হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়াতে রসূলে করীম (সা)-এর সত্য রসূল হওয়ার প্রমাণ এবং এর বিরোধীদের সন্দেহের উত্তর প্রদান করা হয়েছে এবং প্রসঙ্গক্রমে শরীয়তের কয়েকটি হুকুম-আহকামেরও আলোচনা করা হয়েছে।

রিসালত বা নবুয়ত প্রমাণ করার লক্ষ্যে সমস্ত নবী-রসূলকেই মু'জিযা দেওয়া হয়েছিল। সাইয়্যেদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও একই কারণে মু'জিযা দেওয়া হয়েছে এবং অধিক পরিমাণে দেয়া হয়েছে, যা বিগত নবী ও রসূলদের চেয়ে বহুগুণ বেশি ও উৎকৃষ্ট।

রসূলে করীম (সা)-এর যেসব মু'জিযা কোরআন-হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত সেগুলোর সংখ্যাও বিপুল; আলিমরা এ ব্যাপারে স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচনা করেছেন। আল্লামা সুয়ূতী (র) রচিত 'খাসায়েসে কুব্‌রা' এ বিষয়ের উপর রচিত বিরাট দুই খণ্ডের একটি বিখ্যাত গ্রন্থ।

কিন্তু রসূলে করীম (সা)-এর অসংখ্য মু'জিযা মানুষের সামনে আসা সত্ত্বেও বিরোধীরা নিজেদের জেদ ও হঠকারিতাবশত নিজের পক্ষ থেকে নির্ধারণ করে নতুন নতুন মু'জিযা দেখাবার দাবি জানাতে থাকে। আলোচ্য সূরার প্রথমদিকেও সে বিষয় আলোচিত হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের প্রথমটিতে তাদেরকে একটা নীতিগত উত্তর প্রদান করা হয়েছে। তার সার-সংক্ষেপ হচ্ছে এই যে, পয়গম্বরের মু'জিযা হল তাঁর নবুয়ত ও রিসালতের একটি সাক্ষ্য ও প্রমাণ। বস্তুত বাদীর দাবি যখন কোন বিশ্বস্ত ও নিশ্চিত সাক্ষ্য-প্রমাণে প্রমাণিত হয়ে যায় এবং প্রতিপক্ষও যখন তার উপর কোন জেরা বা প্রতিবাদ করে না, তখন তাকে পৃথিবীর কোন আদালতই এমন অধিকার দান করে না যে, সে বাদীর নিকট এমন কোন দাবি পেশ করবে যে, অমুক অমুক বিশেষ বিশেষ লোকের সাক্ষী উপস্থিত করলেই আমরা তা মেনে নেব, অন্যথায় নয়। বর্তমান সাক্ষী-প্রমাণের উপর কোন প্রকার জেরা আরোপ ব্যতীত আমরা মেনে নেব না। অতএব বহুবিধ প্রকাশ্য ও প্রকৃষ্ট মু'জিযা প্রত্যক্ষ করার পর বিরোধীদের একথা বলা যে, অমুক প্রকার মু'জিযা যদি দেখাতে পারেন, তবেই আমরা আপনাকে রসূল বলে মেনে নেব— এটা একান্তই বিদ্বেষমূলক দাবি, যা কোন আদালতই যথার্থ বলে স্বীকার করতে পারে না।

কাজেই প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, যখন আপনি তাদের নির্ধারিত কোন বিশেষ মু'জিযা না দেখান, তখন তারা আপনার রিসালতকে অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে বলে, আপনি অমুক মু'জিযাটি দেখালেন না কেন। অতএব, আপনি তাদেরকে এ উত্তর দিয়ে দিন যে, নিজের ইচ্ছামত কোন রকম মু'জিযা প্রদর্শন করা আমার কাজ নয়। বরং আমার আসল কাজ হল সে সমস্ত আহকামের অনুসরণ করা যা আমার পরওয়ারদিগারের পক্ষ থেকে আমার উপর ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়, যাতে তবলীগ বা প্রচার-প্রসারও অন্তর্ভুক্ত। অতএব, আমি আমার আসল কাজেই নিয়োজিত রয়েছি। তাছাড়া রিসালত প্রমাণের জন্য অন্যান্য মু'জিযাও যথেষ্ট, যা তোমরা সবাই স্বচক্ষে দেখেছ। সেগুলো দেখার পর কোন বিশেষ মু'জিযা প্রদর্শনের দাবি করা একটা বিদ্বেষমূলক দাবি বৈ নয়। এটা লক্ষণীয় হতে পারে না।

আর যে সমস্ত মু'জিযা দেখানো হয়েছে, তন্মধ্যে স্বয়ং কোরআন করীম এমন একটি বিরাট মু'জিযা যাতে সমগ্র বিশ্ব-চরাচরকে প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে যে, আমার মত কিংবা আমার একটি ছোট সূরার অনুরূপ একটি সূরা তৈরী করে দেখাও। কিন্তু সমগ্র বিশ্ব প্রচুর সাধ্য-সাধনা সত্ত্বেও তার উদাহরণ পেশ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এটাই প্রমাণ যে, কোরআন কোন মানুষের বাণী নয়; বরং আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের অনন্য কালাম।

তাই বলা হয়েছে ঃ هٰذَا بَصَائِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ অর্থাৎ এই কোরআন তোমাদের পরওয়ারদিগারের পক্ষ থেকে আগত বহুবিধ দলীল-প্রমাণ ও মু'জিযার এক সমাহার। এতে সামান্য লক্ষ্য করলেই একথা বিশ্বাস না করে উপায় থাকে না যে, এটি যথার্থই আল্লাহ্র কালাম; এতে কোন সৃষ্টিরই কোন হাত নেই। অতপর বলা হয়েছে ঃ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ এই কোরআন সারা বিশ্বের জন্য সত্য দলীল তো বটেই, তদুপরি যারা ঈমানদার তাদেরকে আল্লাহ্র রহমত ও হিদায়েত পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার অবলম্বনও বটে।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, কোরআন মু'মিনদের জন্য রহমত। কিন্তু এই রহমতের দ্বারা লাভবান হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত ও প্রক্রিয়া রয়েছে যা সাধারণ সম্বোধনের মাধ্যমে এভাবে বলা হয়েছে ঃ وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا অর্থাৎ যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা সবাই তার প্রতি কান লাগিয়ে চুপচাপ থাকবে।

এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, এ হুকুমটি কি নামাযের কোরআন পাঠসংক্রান্ত, না কোন বয়ান-বিবৃতিতে কোরআন পাঠের ব্যাপারে, নাকি সাধারণভাবে কোরআন পাঠের বেলায়; তা নামাযেই হোক অথবা অন্য যেকোন অবস্থায় হোক। অধিকাংশ মুফাস্সিরীনের মতে এটাই যথার্থ যে, আয়াতের শব্দগুলো যেমন ব্যাপক, তেমনি এই হুকুমটিও ব্যাপক। কতিপয় নিষিদ্ধ স্থান বা কাল ব্যতীত যেকোন অবস্থায় কোরআন পাঠের ক্ষেত্রে এ নির্দেশ ব্যাপক।

সে কারণেই হানাফী মাযহাবের আলিমরা এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, ইমামের পেছনে নামায পড়ার সময় মুক্তাদীদের জন্য কিরাআত পড়া বিধেয় নয়। পক্ষান্তরে যেসব ফোকাহা মুক্তাদীদের (ইমামের পেছনে নামায পড়ার ক্ষেত্রেও) সূরা ফাতিহা পাঠ করার কথা বলেছেন, তাঁদের মধ্যেও অনেকে বলেছেন যে, ফাতিহা পড়লেও তা ইমামের কিরাআতের ফাঁকে ফাঁকে পড়বে। যা হোক, এটা এই আলোচনার

বিষয় নয়। এ প্রসঙ্গে আলিমরা স্বতন্ত্র ছোট-বড় গ্রন্থ লিখে রেখেছেন; এব্যাপারে সেগুলো পর্যালোচনা করা বান্ছনীয়।

আলোচ্য আয়াতের প্রকৃত বিষয় হল এই যে, কোরআন করীমকে যাদের জন্য রহমত সাব্যস্ত করা হয়েছে, সে জন্য শর্ত হচ্ছে যে, তাদেরকে কোরআনের আদব ও মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হতে হবে এবং এর উপর আমল করতে হবে। আর কোরআনের বড় আদব হলো এই যে, যখন তা পাঠ করা হয়, তখন শ্রোতা সেদিকে কান লাগিয়ে নিশ্চুপ থাকবে।

কোরআন পাঠ শ্রবণ করা এবং তার হুকুম-আহ্কামের উপর আমল করার চেষ্টা করা দুই কান লাগিয়ে রাখার অন্তর্ভুক্ত—(মাযহারী ও কুরতুবী)। আয়াত শেষে لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোরআনের রহমত হওয়া উল্লেখিত আদবসমূহের অনুবর্তিতার উপর নির্ভরশীল।

কোরআন তিলাওয়াতের সময় নীরব থেকে তা শ্রবণ করা সম্পর্কে কয়েকটি জরুরী মাসায়েল ঃ একথা একান্তই সুস্পষ্ট যে, কেউ যদি উল্লেখিত নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে কোরআন-করীমের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করে, তবে সে রহ্মতের পরিবর্তে আল্লাহ্র গযব ও রোষানলের অধিকারী হবে।

নামাযের মধ্যে কোরআনের দিকে কান লাগানো এবং নিশ্চুপ থাকার বিষয়টি মুসলমান মাত্রেরই জানা রয়েছে। তবে অনেক সময় অমনোযোগিতার কারণে এমনও ঘটে যায় যে, অনেকে একথাও বলতে পারে না যে, ইমাম কোন্ সূরাটি পাঠ করেছেন। তাদের পক্ষে কোরআনের মাহাত্ম্য অবগত হওয়া এবং শোনার জন্য মনোনিবেশ করা কর্তব্য। জুম'আ কিংবা ঈদের খুতবার হুকুমও তাই। এই আয়াত ছাড়াও রসূলে করীম (সা) বিশেষ করে খুতবার ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন ঃ اذا خرج الامام فلا صلوة ولا كلام অর্থাৎ ইমাম যখন খুত্বার জন্য এসে উপস্থিত হন, তখন না নামায পড়বে, না কোন কথা বলবে।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, তখন কোন লোক অপর কাউকে উপদেশ দেওয়ার উদ্দেশ্যে একথাও বলবে না যে, 'চুপ কর'। (অগত্যা যদি বলতেই হয়, তবে হাতে ইশারা করে দেবে,) যাহোক, খুত্বা চলাকালে কোন রকম কথাবার্তা, তস্বীহ-তাহলীল, দোয়া-দরূদ কিংবা নামায প্রভৃতি জায়েয নয়।

ফিকাহবিদরা বলেছেন যে, জুম'আর খুতবার যে হুকুম, ঈদ কিংবা বিয়ে প্রভৃতির খুত্বার হুকুমও তাই। অর্থাৎ তখন মনোনিবেশ সহকারে নীরব থাকা ওয়াজিব।

অবশ্যই নামায এবং খুত্বা ব্যতীত সাধারণ অবস্থায় কেউ যখন আপন মনে কোরআন তিলাওয়াত করতে থাকে, তখন অন্যদের কান লাগিয়ে রাখা এবং নীরব

থাকা ওয়াজিব কি নয়, এ ব্যাপারে ফকীহ্দের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কোন কোন মনীষী এমতাবস্থায়ও কান লাগানো এবং নীরব থাকাকে ওয়াজিব বলেছেন ; আর এর বিরুদ্ধাচরণকে পাপ বলে সাব্যস্ত করেছেন। সেজন্যই যেসব স্থানে মানুষ নিজ নিজ কাজকর্মে নিয়োজিত থাকে কিংবা বিশ্রাম করতে থাকে, সেসব জায়গায় কারও পক্ষে সরবে কোরআন পাঠ করাকে তাঁরা অবৈধ বলেছেন এবং যে লোক এমন জায়গায় উচ্চৈঃস্বরে কোরআন পাঠ করবে, তাকে গোনাহ্গার বলেছেন। 'খুলাসাতুল-ফতাওয়া' প্রভৃতি গ্রন্থেও তাই লেখা রয়েছে।

কিন্তু কোন কোন ফকীহ্ বিশ্লেষণ করেছেন যে, কান লাগানো এবং শোনা শুধু-মাত্র সে সমস্ত জায়গায়ই ওয়াজিব, যেখানে শোনাবার উদ্দেশ্যেই কোরআন তিলাওয়াত করা হয়। যেমন, নামায ও খুত্বা প্রভৃতিতে। আর যদি কোন লোক নিজের ভাবে তিলাওয়াত করতে থাকে, কিংবা কয়েকজন কোন এক স্থানে নিজ নিজ তিলাওয়াতে নিয়োজিত থাকে, তাহলে অন্যের আওয়াজের প্রতি কান লাগিয়ে রাখা এবং নীরব থাকা ওয়াজিব নয়। তার কারণ, সহীহ্ ও বিশুদ্ধ হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, রসূলে করীম (সা) রাত্রি বেলায় নামাযে সরবে কোরআন তিলাওয়াত করতেন এবং আয্ওয়াজে মুতাহ্হারাত তখন ঘুমোতে থাকতেন। অনেক সময় হুজরার বাইরেও হুযূর (সা)-এর আওয়ায শোনা যেত।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে আছে যে, হুযূরে আকরাম (সা) কোন এক সফরের সময় রাতে এক জায়গায় অবস্থান করার পর ভোরে বললেন, আমি আমার আশ্আরী সফরসঙ্গীদের তাদের তিলাওয়াতের আওয়াজের দ্বারা রাতের অন্ধ-কারেও চিনে ফেলেছি যে, তাদের তাঁবুগুলো কোন্ দিকে এবং কোথায় অবস্থিত রয়েছে, যদিও দিনের বেলায় তাদের অবস্থান সম্পর্কে আমার জানা ছিল না।

এ ঘটনায়ও রসূলে করীম (সা) সেই আশ্আরী সঙ্গীদের এ ব্যাপারে নিষেধ করেননি যে, কেন তোমরা সশব্দে কিরাআত পড়লে? আর যারা ঘুমোচ্ছিলেন তাদেরকেও এই হিদায়েত দিলেন না যে, যখন কোরআনের তিলাওয়াত হয় তখন তোমরা সবাই উঠে বসবে এবং তা শুনবে।

এ ধরনের রেওয়ায়েতের প্রেক্ষিতে ফোকাহাগণ নামাযের বাইরের তিলাওয়াতের ব্যাপারে কিছুটা অবকাশ রেখেছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও নামাযের বাইরেও যখন কোথাও কোরআনের তিলাওয়াত হয় এবং তার আওয়ায আসে, তখন সেদিকে কান লাগিয়ে নিশ্চুপ থাকা সবারই মতে উত্তম। সেজন্যই যেখানে মানুষ ঘুমোবে কিংবা নিজেদের কাজ-কর্মে নিয়োজিত থাকবে, সেখানে উচ্চৈঃস্বরে কোরআন তিলাওয়াত করা বাঞ্ছনীয় নয়।

এ আলোচনার দ্বারা সে সমস্ত লোকের ভুল ধরা পড়ছে, যারা কোরআন তিলাও-য়াতের সময় এমনসব জায়গায় অথবা ভিড়ে রেডিও খুলে দেয়, যেখানে মানুষ (নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত থাকে এবং) তা শোনার প্রতি মনোনিবেশ করে না। তেমনিভাবে

রাতের বেলায় লাউড স্পীকার লাগিয়ে মসজিদসমূহে এমনভাবে কোরআন তিলাওয়াত করা জায়েয নয়, যাতে তার শব্দের দরুন মানুষের ঘুম কিংবা কাজকর্মের ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

আল্লামা ইবনে হুমাম (র) লিখেছেন, ইমাম যখন নামাযে কিংবা খুত্‌বায় বেহেশত-দোযখ সংক্রান্ত কোন বিষয় পড়তে কিংবা বলতে থাকেন, তখন জান্নাত লাভের দোয়া কিংবা দোযখ থেকে মুক্তি কামনা করাও জায়েয নয়। কারণ, আলোচ্য আয়াতের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা রহমতের ওয়াদা সে সমস্ত লোকের জন্যই করেছেন, যারা তিলাওয়াতের সময় নীরব-নিশ্চুপ থাকবে না, এ ওয়াদা তাদের জন্য নয়। অবশ্য নফল নামাযে এ ধরনের আয়াতের তিলাওয়াত শেষে সংগোপনে দোয়া করে নেওয়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং সওয়াবের কারণ।—(মাযহারী)

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيُسَبِّحُوْنَهٗ وَلَهٗ يَسْجُدُوْنَ ۩ ۝

(২০৫) আর স্মরণ করতে থাক স্বীয় প্রতিপালককে আপন মনে ক্রন্দনরত ও ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় এবং এমন স্বরে যা চিৎকার করে বলা অপেক্ষা কম; সকালে ও সন্ধ্যায়। আর বে-খবর থেকো না। (২০৬) নিশ্চয়ই যারা তোমার পরওয়ারদিগারের সান্নিধ্যে রয়েছেন, তারা তাঁর বন্দেগীর ব্যাপারে অহঙ্কার করেন না এবং স্মরণ করেন তাঁর পবিত্র সত্তাকে, আর তাঁকেই সিজদা করেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (আপনি সবাইকে এ কথাও বলে দিন যে,) হে মানুষ, স্বীয় পরওয়ার-দিগারকে স্মরণ করতে থাক (কোরআন পাঠ কিংবা তস্‌বীহ-তাহ্‌লীলের মাধ্যমে) নিজের মনে, একান্ত বিনয়ের সাথে (সে স্মরণ চাই মনে অর্থাৎ নীরবেই হোক অথবা) চিৎকার অপেক্ষা কম স্বরেই হোক। (এমনি বিনয় ও ভীতির সাথে) সকাল-সন্ধ্যায় (অর্থাৎ নিয়মিতভাবে স্মরণ কর)। আর (নিয়মিতভাবে স্মরণ করার অর্থ এই যে,) শৈথিল্যপরায়ণদের মধ্যে পরিগণিত হবে না (যে, নির্ধারিত ও বিধিবদ্ধ যিকির-আয্‌কারও পরিহার করে থাকবে)। নিশ্চয়ই যে সমস্ত ফেরেশতা তোমাদের পরওয়ারদিগারের নিকট (সান্নিধ্যপ্রাপ্ত) রয়েছেন, তারা তাঁর ইবাদত-বন্দেগীর ব্যাপারে (যার মূল হল

আকীদা বা বিশ্বাস) অহঙ্কার করে না এবং তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকে (যা মুখের ইবাদত), আর তাঁকে সিজদা করে (যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এর পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে কোরআন মজীদ শোনার এবং তার রীতিনীতি সংক্রান্ত আলোচনা ছিল। বর্তমান দু'টি আয়াতে অধিকাংশের মতে সাধারণভাবে আল্লাহ্র যিকির এবং তার আদব-কায়দা বা রীতিনীতির বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এতে অবশ্য কোরআন তিলাওয়াতও অন্তর্ভুক্ত। আর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে আলোচ্য এ আয়াতটি কোরআন তিলাওয়াত সংক্রান্ত এবং এতেও কোরআন তিলাওয়াতের আদব সম্পর্কেই বলা হয়েছে। কিন্তু এটা কোন মতপার্থক্য নয়। কারণ, কোরআন তিলাওয়াত ছাড়া অন্যান্য যিকির-আযকারের বেলায়ও যে এই হুকুম ও আদব রয়েছে এ ব্যাপারে সবাই একমত।

সারকথা, এ আয়াতে মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ ও যিকির-আযকারের বিধি-বিধান এবং সেই সঙ্গে তার সময় ও আদ্ব-কায়দা বাতলে দেয়া হয়েছে।

নীরব ও সরব যিকিরের বিধি-বিধান ঃ যিকিরের প্রথম আদব হল নিঃশব্দ যিকির কিংবা সশব্দ যিকিরসংক্রান্ত। এ আয়াতে কোরআন করীম নিঃশব্দ যিকির কিংবা সশব্দ যিকির—দু'রকম যিকিরেরই স্বাধীনতা দিয়েছে। নিঃশব্দ যিকির সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ অর্থাৎ স্বীয় পরওয়ারদিগারকে স্মরণ কর নিজের মনে।

এরও দু'টি উপায় রয়েছে। এক. জিহবা না নেড়ে শুধু মনে মনে আল্লাহ্র 'যাত' (সত্তা) ও গুণাবলীর ধ্যান করবে, যাকে 'যিকিরে ক্বল্‌বী' (আত্মিক যিকির) বা 'তাফাক্কুর' (নিবিষ্ট চিন্তা) বলা হয়। দুই. তৎসঙ্গে মুখেও ক্ষীণ শব্দে আল্লাহ্ তা'আলার নামের অক্ষরগুলো উচ্চারণ করবে। এটাই হল যিকিরের সর্বোত্তম ও উৎকৃষ্টতর উপায় যে, যে বিষয়ের যিকির করা হচ্ছে তার বিষয়বস্তু উপলব্ধি করে অন্তরেও তার প্রতিফলন ঘটিয়ে ধ্যান করবে এবং মুখেও তা উচ্চারণ করবে। কারণ, এভাবে অন্তরের সাথে মুখেও যিকিরে অংশগ্রহণ করে। পক্ষান্তরে যদি শুধু মনে মনেই ধ্যান ও চিন্তায় মগ্ন থাকে, মুখে কোন অক্ষর উচ্চারিত না হয়, তবে তাতে যথেষ্ট সওয়াব রয়েছে, কিন্তু সর্বনিম্ন স্তর হল শুধু মুখে মুখে যিকির করা, অন্তরাত্মার তা থেকে বিমুখ থাকা। এমনি যিকির সম্পর্কে মাওলানা রূমী বলেছেন ঃ

بر زبان تسبیح و در دل گاؤ خر-
این چنین تسبیح کے دارد اثر

অর্থাৎ মুখে মুখে জপতপ, আর অন্তরে গাধা-গরু; এহেন জপতপে কেমন করে আছর হবে।

এতে মাওলানা রূমীর উদ্দেশ্য হল এই যে, গাফেল মনে যিকির করাতে যিকিরের পরিপূর্ণ ক্রিয়া ও বরকত হয় না। একথা অনস্বীকার্য যে, এই মৌখিক যিকিরও পুণ্য ও উপকারিতা বিবর্জিত নয়। কারণ, অনেক সময় এই মৌখিক যিকিরই আন্তরিক যিকিরের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, মুখে বলতে বলতেই এক সময় মনেও তার প্রভাব বিস্তার লাভ করে। তাছাড়া অন্তত একটি অঙ্গ তো যিকিরে নিয়োজিত থাকেই। তাই তাও পুণ্যহীন নয়। অতএব, যিকির-আযকারে যাদের মন বসে না এবং ধ্যানের মাঝে আল্লাহ্‌র গুণাবলী প্রতিফলিত করা যাদের পক্ষে সম্ভব হয় না, তারাও এই মৌখিক যিকিরকে নিরর্থক ভেবে পরিহার করবেন না; চালিয়ে যাবেন এবং মনে তার প্রতিফলন ঘটতে চেষ্টা করতে থাকবেন।

দ্বিতীয় যিকিরের পন্থা। এ আয়াতেই বলা হয়েছে ঃ وَدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ অর্থাৎ সুউচ্চ স্বরের চাইতে কম স্বরে। অর্থাৎ যে লোক আল্লাহ্ তা'আলার যিকির করবে তার সশব্দ যিকির করারও অধিকার রয়েছে, তবে তার আদব হল এই যে, অত্যন্ত জোরে চিৎকার করে যিকির করবে না। মাঝামাঝি আওয়াজে করবে যাতে আদব এবং মর্যাদাবোধের প্রতি লক্ষ্য থাকে। অতি উচ্চৈঃস্বরে যিকির বা তিলাওয়াত করাতে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, যার উদ্দেশ্যে যিকির করা হচ্ছে, তাঁর মর্যাদাবোধ অন্তরে নেই। যে সত্তার সম্মান ও মর্যাদা এবং ভয় মানব মনে বিদ্যমান থাকে, তাঁর সামনে স্বভাবগতভাবেই মানুষ অতি উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে পারে না। কাজেই আল্লাহ্‌র সাধারণ যিকিরই হোক, কিংবা কোরআনের তিলাওয়াতই হোক, যখন আওয়াজের সাথে পড়া হবে, তখন সেদিকে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য যাতে তা প্রয়োজনের চাইতে বেশি উচ্চৈঃস্বরে না হতে পারে।

সারকথা এই যে, এ আয়াতের দ্বারা আল্লাহ্‌র যিকির বা কোরআন তিলাওয়াতের তিনটি পদ্ধতি বা নিয়ম জানা গেল। প্রথমত, আত্মিক যিকির। অর্থাৎ কোরআনের মর্ম এবং যিকিরের কল্পনা ও চিন্তার মাঝেই যা সীমিত থাকবে, যার সাথে জিহবার সামান্যতম স্পন্দনও হবে না। দ্বিতীয়ত. যে যিকিরে আত্মার চিন্তা-কল্পনার সাথে সাথে জিহবাও নড়বে। কিন্তু বেশি উচ্চ শব্দ হবে না, যা অন্যান্য লোকেও শুনবে। এ দু'টি পদ্ধতিই আল্লাহর বাণী وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ-এর অন্তর্ভুক্ত। আর তৃতীয় পদ্ধতিটি হল অন্তরে উদ্দিষ্ট সত্তার উপস্থিতি ও ধ্যান করার সাথে সাথে জিহবার স্পন্দনও হবে এবং সেই সঙ্গে শব্দও বেরোবে। কিন্তু এই পদ্ধতির জন্য আদব বা রীতি হল আওয়াজকে অধিক উচ্চ না করা। মাঝামাঝি সীমার বাইরে যাতে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। যিকিরের এ পদ্ধতিটিই وَدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ

আয়াতে শেখানো হয়েছে। কোরআনের আরও একটি আয়াতে বিষয়টিকে বিশেষ বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে ঃ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا —এতে রসূলে করীম (সা)-এর প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে, যাতে কিরাআত পড়তে গিয়ে অতি উচ্চৈঃস্বরেও পড়া না হয় এবং একেবারে মনে মনেও নয়। বরং কিরাআতে যেন মাঝামাঝি আওয়াজ অবলম্বন করা হয়।

নামাযের মাঝে কোরআন তিলাওয়াত সম্পর্কে মহানবী (সা) হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) ও হযরত ফারূকে আযম (রা)-কে এ হিদায়েতই দিয়েছেন।

সহীহ্ ও বিশুদ্ধ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, একবার রসূলে করীম (সা) শেষ রাতে ঘর থেকে বেরিয়ে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর বাড়ি গিয়ে দেখলেন, তিনি নামায পড়ছেন। কিন্তু তাতে আস্তে আস্তে অর্থাৎ শব্দহীনভাবে কোরআন তিলাওয়াত করছেন। তারপর তিনি [হুযূর (সা)] সেখান থেকে হযরত উমর ফারূক (রা)-এর বাড়ি গিয়ে দেখলেন, তিনি অতি উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াত করছেন। অতপর ভোরে যখন উভয়ে হুযূরে আকরাম (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন, আমি রাতের বেলায় আপনার নিকট গিয়ে দেখলাম, আপনি অতি ক্ষীণ আওয়াযে কোরআন তিলাওয়াত করছিলেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্, যে সত্তাকে শোনানো আমার উদ্দেশ্য ছিল তিনি শুনে নিয়েছেন, তাই যথেষ্ট নয় কি? তেমনিভাবে হযরত ফারূকে আযম (রা)-কে লক্ষ্য করে হুযূর (সা) বললেন, আপনি অতি উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াত করছিলেন। তিনি নিবেদন করলেন, উচ্চ শব্দে কিরআত পড়তে গিয়ে আমার উদ্দেশ্য ছিল, যাতে ঘুম না আসে এবং শয়তান যেন সে শব্দ শুনে পালিয়ে যায়। অতপর হুযূরে আকরাম (সা) মীমাংসা করে দিলেন। তিনি হযরত সিদ্দীকে-আকবর (রা)-কে কিছুটা জোরে এবং হযরত ফারূকে আযম (রা)-কে কিছুটা আস্তে তিলাওয়াত করতে বললেন।—(আবূ-দাউদ)

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত রয়েছে, কিছু লোক হযরত আয়েশা (রা)-র নিকট হুযূর আকরাম (সা)-এর তিলাওয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন যে, তিনি কি উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াত করতেন, না আস্তে আস্তে। উত্তরে হযরত আয়েশা (রা) বললেন, কখনও জোরে, আবার কখনও আস্তে আস্তে তিলাওয়াত করতেন।

রাত্রিকালীন নফল নামাযে এবং নামাযের বাইরে তিলাওয়াতে কোন কোন মনীষী জোরে তিলাওয়াত করাকে পছন্দ করেছেন আর কেউ কেউ আস্তে পড়াকে পছন্দ করেছেন। সে জন্যই ইমাম আযম হযরত আবূ-হানীফা (র) বলেছেন যে,

যে লোক তিলাওয়াত করবে তার যে-কোনভাবে তিলাওয়াত করার অধিকার রয়েছে। তবে সশব্দে তিলাওয়াত করার জন্য সবার মতেই কয়েকটি প্রয়োজনীয় শর্ত রয়েছে। প্রথমত তাতে নাম-যশ এবং রিয়াকারী বা লোক-দেখানোর কোন আশংকা থাকবে না। দ্বিতীয়ত তার শব্দে অন্য লোকদের ক্ষতি কিংবা কষ্ট হবে না। অন্য কোন লোকের নামায, তিলাওয়াত কিংবা কাজকর্মে অথবা বিশ্রামে কোন রকম ব্যাঘাত যেন না হয়। যেখানে নাম-যশ ও রিয়াকারী কিংবা অন্যান্য লোকের কাজ-কর্ম অথবা আরাম-বিশ্রামের ব্যাঘাত সৃষ্টির আশংকা থাকবে, সে ক্ষেত্রে আস্তে আস্তে তিলাওয়াত করাই সবার মতে উত্তম।

আর কোরআন তিলাওয়াতের যে হুকুম অন্যান্য যিকির-আযকার ও তসবীহ তাহ্‌লীলেরও একই হুকুম। অর্থাৎ আস্তে আস্তে কিংবা শব্দ করে উভয়ভাবে পড়াই জায়েয রয়েছে। অবশ্য আওয়ায এমন উচ্চ হবে না যা বিনয়, নম্রতা ও আদবের খেলাফ হবে। তাছাড়া তার সে আওয়াযে অন্য লোকের কাজকর্ম কিংবা আরাম-বিশ্রামেরও যেন ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়।

তবে সরব ও নীরব যিকিরের মধ্যে কোনটি বেশি উত্তম, তার ফয়সালা ব্যক্তি ও অবস্থাভেদে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। কারো জন্য জোরে যিকির করা উত্তম; আর কারো জন্য আস্তে করা উত্তম। কোন সময় জোরে যিকির করা উত্তম আবার কোন সময় আস্তে করা উত্তম।—(তফসীরে মাযহারী, রূহুল বয়ান প্রভৃতি)

তিলাওয়াত ও যিকিরের দ্বিতীয় আদব হল, নম্রতা ও বিনয়ের সাথে যিকির করা। তার মর্ম এই যে, মানুষের অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ত্ব ও মহিমা উপস্থিত থাকতে হবে এবং যা কিছু যিকির করা হবে, তার অর্থ ও মর্ম সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে।

আর তৃতীয় আদব আলোচ্য আয়াতের خِيْفَةً শব্দের দ্বারা বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, তিলাওয়াত ও যিকিরের সময়ে মানব মনে আল্লাহ্‌র ভয়-ভীতির অবস্থা সঞ্চারিত হতে হবে। ভয় এ কারণে যে, আমরা আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত ও মহত্ত্বের পুরোপুরি হক আদায় করতে পারছি না, আমাদের দ্বারা না জানি বে-আদবী হয়ে যায়। তাছাড়া স্বীয় পাপের কথা স্মরণ করে আল্লাহ্‌র আযাবের ভয়; শেষ পরিণতি কি হয়, কোন্ অবস্থায় না জানি আমাদের মৃত্যু ঘটে। যা হোক, যিকির ও তিলাওয়াত এমন-ভাবে করতে হবে, যেমন কোন ভীত-সন্ত্রস্ত ব্যক্তি করে থাকে।

দোয়া-প্রার্থনার এ সমস্ত আদব-কায়দাই উক্ত সূরা আ'রাফের প্রারম্ভে— اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً আয়াতে আলোচিত হয়েছে। তাতে خِيْفَةً -এর পরিবর্তে خُفْيَةً শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তার অর্থ হল নীরবে বা নিঃশব্দে যিকির করা। এতে বোঝা যায় নিঃশব্দে এবং আস্তে আস্তে যিকির করাও যিকিরের একটি আদব।

কিন্তু এ আয়াতে এ কথাও পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, যদিও সশব্দে যিকির করা নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত উচ্চৈঃস্বরে করবে না এবং এমন উচ্চৈঃস্বরে করবে না, যাতে বিনয় ও নম্রতা বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে।

আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে যিকির ও তিলাওয়াতের সময় বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, তা হবে সকাল ও সন্ধ্যায়। এর অর্থ এও হতে পারে যে, দৈনিক অন্তত দু'বেলা, সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র যিকিরে আত্মনিয়োগ করা কর্তব্য। আর এ অর্থও হতে পারে যে, সকাল-সন্ধ্যা বলে দিবা-রাত্রির সব সময়কে বোঝানো হয়েছে। পূর্ব-পশ্চিম বলে যেমন সারা দুনিয়াকে বোঝানো হয়। তখন আয়াতের অর্থ হবে এই যে, সর্বদা, সর্বাবস্থায় যিকির ও তিলাওয়াতে নিয়মানুবর্তী হওয়া মানুষের একান্ত কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা (রা) বলেন, হুযূরে আকরাম (সা) সর্বদা, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র স্মরণে নিয়োজিত থাকতেন।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছেঃ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র স্মরণ ত্যাগ করে গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেও না। কারণ, এ'টি বড়ই ক্ষতিকারক।

দ্বিতীয় আয়াতে মানুষের শিক্ষা ও উপদেশের জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলার দরবারে নৈকট্য লাভকারীদের এক বিশেষ অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্‌ তা'আলার নৈকট্য লাভ করেছে তারা তাঁর ইবাদতের ব্যাপারে গর্ব বা অহঙ্কার করে না। এখানে আল্লাহ্‌ নিকটে থাকা অর্থ আল্লাহ্‌র প্রিয় হওয়া। এতে সমস্ত ফেরেশতা, সমস্ত নবী-রসূল এবং সমস্ত সৎকর্মশীল লোকই অন্তর্ভুক্ত। আর তাকাব্বুর বা অহংকার না করা অর্থ হল এই যে, নিজে নিজেকে বড় মনে করে ইবাদতের ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি না করা। বরং নিজেকে অসহায়, মুখাপেক্ষী মনে করে সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র স্মরণে ও ইবাদতে নিয়োজিত থাকা, তসবীহ্‌-তাহ্‌লীল করতে থাকা এবং আল্লাহ্‌কে সিজদা করতে থাকা।

এতে এ কথাও প্রতীয়মান হচ্ছে যে, সার্বক্ষণিক ইবাদত ও আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার তওফীক যাদের ভাগ্যে হয়, তারা সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে এবং তাদের আল্লাহ্‌ রব্বুল আলামীনের সান্নিধ্য হাসিল হয়েছে।

সিজদার কতিপয় ফযীলত ও আহ্‌কামঃ এখানে নামায সংক্রান্ত ইবাদতের মধ্য থেকে শুধু সিজদার কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, নামাযের সমগ্র আরকানের মধ্যে সিজদার একটি বিশেষ ফযীলত রয়েছে।

সহীহ্‌ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে যে, কোন এক লোক হযরত সাওবান (রা)-এর নিকট নিবেদন করলেন যে, আমাকে এমন একটা আমল বাতলে দিন, যাতে আমি জান্নাতে যেতে পারি। হযরত সাওবান (রা) নীরব রইলেন; কিছুই বললেন না।

লোকটি আবার নিবেদন করলেন, তখনও তিনি চুপ করে রইলেন। এভাবে তৃতীয় বার যখন বললেন, তখন তিনি বললেন, আমি এ প্রশ্নটিই রসূলে করীম (সা)-এর দরবারে করেছিলাম। তিনি আমাকে ওসীয়ত করেছিলেন যে, অধিক পরিমাণে সিজদা করতে থাক। কারণ, তোমরা যখন একটি সিজদা কর, তখন তার ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মর্যাদা এক ডিগ্রী বাড়িয়ে দেন এবং একটি গোনাহ্ ক্ষমা করে দেন।

লোকটি বললেন, হযরত সাওবান (রা)-এর সাথে আলাপ করার পর আমি হযরত আবুদ্দার্দা (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর কাছেও একই নিবেদন করলাম এবং তিনিও একই উত্তর দিলেন।

সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, রসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, বান্দা স্বীয় পরওয়ারদিগারের সর্বাধিক নিকটবর্তী তখনই হয়, যখন সে বান্দা সিজদায় অবনত থাকে। কাজেই তোমরা সিজদারত অবস্থায় খুব বেশি করে দোয়া প্রার্থনা করবে। তাতে তা কবূল হওয়ার যথেষ্ট আশা হয়েছে।

মনে রাখতে হবে যে, শুধুমাত্র সিজদা হিসাবে কোন ইবাদত নেই। কাজেই ইমাম আযম হযরত আবূ হানীফা (র)-র মতে অধিক পরিমাণে সিজদা করার অর্থ অধিক পরিমাণে নফল নামায পড়া। নফল যত বেশি হবে সিজদাও ততই বেশি হবে।

কিন্তু কোন লোক যদি শুধু সিজদা করেই দোয়া করে নেয়, তাহলে তাতেও কোন ক্ষতি নেই। আর সিজদারত অবস্থায় দোয়া করার হিদায়েত শুধু নফল নামাযের সাথেই সম্পৃক্ত; ফরয নামাযে নয়।

সূরা আ'রাফ শেষ হল। এর শেষ আয়াতটি হল আয়াতে সিজদা। সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত রয়েছে যে, কোন আদম সন্তান যখন কোন সিজদার আয়াত পাঠ করে, অতপর সিজদায়ে তিলাওয়াত সম্পন্ন করে, তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে পালিয়ে যায় এবং বলে যে, আফসোস্, মানুষের প্রতি সিজদার হুকুম হল আর সে তা আদায়ও করলো, ফলে তার ঠিকানা হল জান্নাত, আর আমার প্রতিও সিজদার হুকুম হয়েছে, কিন্তু আমি তার না-ফরমানী করেছি বলে আমার ঠিকানা হল জাহান্নাম।

سورة الانفال

সূরা আনফাল

মদীনায় অবতীর্ণ। ৭৫ আয়াত, ১০ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ۭ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۠ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ①

॥ পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি ॥

(১) আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে, গনীমতের হুকুম। বলে দিন, গনীমতের মাল হল আল্লাহ্‌র এবং রসূলের। অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নাও। আর আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রসূলের হুকুম মান্য কর—যদি ঈমানদার হয়ে থাক।

সূরার বিষয়বস্তু

সূরা আন্‌ফাল এখন যা আরম্ভ হচ্ছে, এটি মদীনায় অবতীর্ণ সূরা। এর পূর্ববর্তী সূরা আ'রাফে মুশরিকীন (অংশীবাদী) এবং আহলে-কিতাবের মূর্খতা, বিদ্বেষ, কুফরী ও ফিতনা-ফাসাদ সংক্রান্ত আলোচনা এবং তৎসম্পর্কিত বিষয়ের বর্ণনা ছিল।

বর্তমান সূরাটিতে আলোচিত অধিকাংশ বিষয়ই গয্‌ওয়ায়ে বদর বা বদরের যুদ্ধকালে সেই কাফির, মুশরিক ও আহলে-কিতাবের অশুভ পরিণতি, তাদের পরাজয় ও অকৃতকার্যতা এবং তাদের মুকাবিলায় মুসলমানদের কৃতকার্যতা সম্পর্কিত, যা মুসলমানদের জন্য ছিল একান্ত কৃপা ও দান এবং কাফিরদের জন্য ছিল আযাব ও প্রতিশোধস্বরূপ।

আর যেহেতু এই কৃপা ও দানের সবচাইতে বড় কারণ ছিল মুসলমানদের নিঃস্বার্থতা, পারস্পরিক ঐক্য, আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের পরিপূর্ণ আনুগত্যের ফল, সেহেতু

সূরার প্রারম্ভেই তাক্ওয়া, পরহিযগারী এবং আল্লাহ্র আনুগত্য, যিকির ও ভরসা প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এসব লোক আপনার নিকট গনীমতের মাল সম্পর্কিত হুকুম জানতে চায়। আপনি জানিয়ে দিন যে, যাবতীয় গনীমত আল্লাহ্র (অর্থাৎ সেগুলো আল্লাহ্র মালিকানা ও অধিকারভুক্ত। তিনি এ সম্পর্কে যা ইচ্ছা নির্দেশ দেবেন) এবং (এগুলো এ অর্থে) রসূল (সা)-এর (যে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে হুকুম পেয়ে তা জারি করবেন। অর্থাৎ গনীমতের মাল-আসবাবসমূহের ব্যাপারে তোমাদের কোন মতামত কিংবা প্রস্তাবের কোন সুযোগ নেই। বরং তার ফয়সালা হবে শরীয়তের হুকুম অনুযায়ী।) অতএব, তোমরা (পার্থিব লোভ করো না; আখিরাতের অন্বেষায় থাক। তা এভাবে যে,) আল্লাহ্কে ভয় কর এবং নিজেদের পারস্পরিক অবস্থার সংশোধন করে নাও (যাতে পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও ঈর্ষা না থাকে)। আর আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের অনুসরণ কর যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ আয়াতটি বদর যুদ্ধে সংঘটিত একটি ঘটনার সাথে সম্পর্কিত। আয়াতের বিস্তারিত তফসীরের আগে সে-ঘটনাটি সামনে রাখা হলে এর তফসীর বুঝতে একান্ত সহজ হয়ে যাবে বলে আশা করি:

ঘটনাটি হল এই যে, কুফর ও ইসলামের প্রথম সংঘর্ষ বদর যুদ্ধে যখন মুসলমানদের বিজয় সূচিত হয়ে গেল এবং কিছু গনীমতের মাল-সামান হাতে এল, তখন সেগুলোর বিলি-বন্টন নিয়ে সাহাবায়ে-কিরামের মধ্যে এমন এক ঘটনা ঘটে যা নিঃস্বার্থতা, ইখলাস ও ঐক্যের সেই সুউচ্চ মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না, যার ভিত্তিতে সাহাবায়ে-কিরাম (রা)-এর গোটা জীবন ঢেলে সাজানো ছিল। সেজন্য সর্বাগ্রে এ আয়াতে তার সমাধান করে দেয়া হয়, যাতে করে এই পূত-পবিত্র এবং নিষ্কলুষ সম্প্রদায়ের অন্তরে বিশ্বাস ও নিঃস্বার্থতা এবং ঐক্য ও আত্মত্যাগের প্রেরণা ছাড়া অন্য কোন বিষয় থাকতে না পারে।

এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী হযরত ওবাদা (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে মসনদে আহমদ, তিরমিযী, ইবনে-মাজা, মুসতাদরাকে-হাকেম প্রভৃতি গ্রন্থে এভাবে উদ্ধৃত রয়েছে যে, হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা)-এর নিকট কোন এক ব্যক্তি আয়াতে উল্লিখিত أَنْفَال (আনফাল) শব্দের মর্ম জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, "এ আয়াতটি তো আমাদের অর্থাৎ বদর যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। সে ঘটনাটি ছিল এই যে, গনীমতের মালামাল বিলি-বন্টন ব্যাপারে আমাদের মাঝে সামান্য মতবিরোধ হয়ে গিয়েছিল, যাতে আমাদের পবিত্র

চরিত্রে একটা অশুভ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আল্লাহ্ এ আয়াতের মাধ্যমে গনীমতের সমস্ত মালামাল আমাদের হাত থেকে নিয়ে রসূলে করীম (সা)-এর দায়িত্বে অর্পণ করেন। আর রসূলে করীম (সা) বদরে অংশগ্রহণকারী সবার মধ্যে সমানভাবে সেগুলো বন্টন করে দেন।

ব্যাপার ঘটেছিল এই যে, বদরের যুদ্ধে আমরা সবাই রসূলে করীম (সা)-এর সাথে বেরিয়ে যাই এবং উভয় দলের মধ্যে তুমুল যুদ্ধের পর আল্লাহ্ তা'আলা যখন শত্রুদের পরাজিত করে দেন, তখন আমাদের সেনাবাহিনী তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। কিছু লোক শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করেন, যাতে তারা পুনরায় ফিরে আসতে না পারে। কিছু লোক কাফিরদের পরিত্যক্ত গনীমতের মালামাল সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন। আর কিছু লোক রসূলে করীম (সা)-এর পাশে এসে সমবেত হন, যাতে গোপনে লুকিয়ে থাকা কোন শত্রু মহানবী (সা)-র উপর আক্রমণ করতে না পারে। যুদ্ধ শেষে সবাই যখন নিজেদের অবস্থানে এসে উপস্থিত হন, তখন যাঁরা গনীমতের মালামাল সংগ্রহ করেছিলেন, তাঁরা বলতে লাগলেন যে, এ সমস্ত মালামাল যেহেতু আমরা সংগ্রহ করেছি, কাজেই এতে আমাদের ছাড়া অপর কারও ভাগ নেই। আর যারা শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়েছিলেন তাঁরা বললেন, এতে তোমরা আমাদের চাইতে বেশি অধিকারী নও। কারণ, আমরাই তো শত্রুকে হটিয়ে দিয়ে তোমাদের জন্য সুযোগ করে দিয়েছি, যাতে তোমরা নিশ্চিন্তে গনীমতের মালামাল সংগ্রহ করে আনতে পার। পক্ষান্তরে যারা মহানবী (সা)-র হিফাযতকল্পে তাঁর পাশে সমবেত ছিলেন, তাঁরা বললেন, আমরাও ইচ্ছা করলে গনীমতের এই মাল সংগ্রহে তোমাদের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারতাম, কিন্তু আমরা জিহাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হুযূরে আকরাম (সা)-এর হিফাযতের কাজে নিয়োজিত ছিলাম। অতএব আমরাও এর অধিকারী।

সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর এসব কথাবার্তা হুযূর (সা) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলে পর এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এসব মালামাল আল্লাহ্ তা'আলার; একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত এর অন্য কোন মালিক বা অধিকারী নেই, শুধু তাঁকে ছাড়া যাঁকে রসূলে করীম (সা) দান করেন। সুতরাং মহানবী (সা) আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের নির্দেশ অনুযায়ী এসব মালামাল জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সমানভাবে বন্টন করে দেন।—(ইবনে-কাসীর) অতপর সবাই আল্লাহ্ ও রসূলের এই সিদ্ধান্তের উপর রাযী হয়ে যান এবং তাঁদের মহান মর্যাদার পরিপন্থী পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল সেজন্য সবাই লাজ্জিত হন।

এছাড়া মসনদে আহমদ এ আয়াতের শানে-নুযূলের ব্যাপারে হযরত সা'দ ইবনে আবী ওক্কাস (রা) থেকে অপর একটি ঘটনা উদ্ধৃত রয়েছে। তিনি বলেন যে, গযওয়ায়ে ওহুদে আমার ভাই ওমাইর (রা) শাহাদত বরণ করেন। আমি প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে মুশরিকদের মধ্য থেকে সাঈদ ইবনুল আ'সকে হত্যা করে ফেলি এবং তার তলোয়ারটি তুলে নিয়ে মহানবী (সা)-র খিদমতে উপস্থিত হই। এই তলোয়ারটি যাতে আমি

পেতে পারি তাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু মহানবী (সা) নির্দেশ দিলেন, এটি গনীমতের মালের সাথে জমা করে দাও। নির্দেশ পালনে আমি বাধ্য হলাম, কিন্তু আমার মন এতে কঠিন বেদনা অনুভব করছিল যে, আমার ভাই শহীদ হলেন এবং তার বিনিময়ে আমি একটি শত্রুকে হত্যা করে তার তলোয়ার লাভ করলাম, অথচ তাও আমার কাছ থেকে নিয়ে নেয়া হলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও হুকুম তামিলার্থ মালে-গনীমতে জমা দেয়ার জন্য এগিয়ে গেলাম। আমি খুব একটা দূরে না যেতেই হুযূর (সা)-এর উপর সূরা আন্‌ফালের এ আয়াতটি নাযিল হল এবং তিনি আমাকে ডেকে তলোয়ারটি দিয়ে দিলেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে একথাও রয়েছে যে, হযরত সা'দ রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে নিবেদনও করেছিলেন যে, তলোয়ারটি আমাকে দিয়ে দেয়া হোক। কিন্তু তিনি বললেন, এটা আমার জিনিস না যে কাউকে দিয়ে দেব, আর না এতে তোমার কোন মালিকানা রয়েছে। কাজেই এটা অন্যান্য গনীমতের মালের সাথে জমা করে দাও। এর ফয়সালা আল্লাহ্ তা'আলা যা করবেন, তাই হবে।——(ইবনে কাসীর, মাযহারী)

এতদুভয় ঘটনা সংঘটিত হওয়া এবং উভয় ঘটনার প্রত্যুত্তরেই এ আয়াতটি নাযিল হওয়া অসম্ভব নয়।

أَنْفَالُ শব্দটি نَفَلٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ অনুগ্রহ, দান ও উপঢৌকন। নফল নামায, রোযা, সদ্‌কা প্রভৃতিকে 'নফল' বলা হয় যে, এগুলো কারো উপর অপরিহার্য কর্তব্য ও ওয়াজিব নয়। যারা তা করে, নিজের খুশিতেই করে থাকে। কোরআন ও সুন্নাহ্‌র পরিভাষায় نفل ও انفال (নফল ও আন্‌ফাল) গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ মালামালকে বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়, যা যুদ্ধকালে কাফিরদের কাছ থেকে লাভ করা হয়। তবে কোরআন মজীদে এতদর্থে তিনটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে—১. আন্‌ফাল ২. গনীমত এবং ৩. ফায়। انفال শব্দটি তো এ আয়াতেই রয়েছে। আর غَنِيمَةٌ (গনীমত) শব্দ এবং তার বিশ্লেষণ এ সূরার একচল্লিশতম আয়াতে আসবে। আর فَىْءٌ এবং তার ব্যাখ্যা সূরা হাশরের আয়াত وَمَا أَفَاءَ اللّٰهُ ..... প্রসঙ্গে করা হয়েছে। এ তিনটি শব্দের অর্থ যৎসামান্য পার্থক্যসহ বিভিন্ন রকম। সামান্য ও সাধারণ পার্থক্যের কারণে অনেক সময় একটি শব্দকে অন্যটির জায়গায় শুধু 'গনীমতের মাল' অর্থেও ব্যবহার করা হয়। انفال (গনীমত) সাধারণত সে মালকে বলা হয়, যা যুদ্ধ-জিহাদের মাধ্যমে বিরোধী দলের কাছ থেকে হাসিল করা হয়। আর فَيْءٌ (ফায়) বলা হয় সে মালকে, যা কোন রকম যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই কাফিরদের কাছ থেকে পাওয়া যায়। তা সেগুলো ফেলে কাফিররা পালিয়েই যাক, অথবা স্বেচ্ছায় দিয়ে দিতে রাযী হোক। আর نفل ও انفال (নফল ও আন্‌ফাল) শব্দটি অধিকাংশ সময় আন্‌আম বা পুরস্কার অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যা জিহাদের

নায়ক কোন বিশেষ মুজাহিদকে তার কৃতিত্বের বিনিময় হিসাবে গনীমতের প্রাপ্য অংশের অতিরিক্ত পুরস্কার দিয়ে থাকেন। তফসীরে ইবনে জরীর গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ অর্থই উদ্ধৃত করা হয়েছে।—(ইবনে কাসীর) আবার কখনও 'নফল' ও 'আন্‌ফাল' শব্দ দ্বারা সাধারণ গনীমতের মালকেও বোঝানো হয়। এ আয়াতের ক্ষেত্রেও অধিকাংশ তফসীরকার এই সাধারণ অর্থই গ্রহণ করেছেন। সহীহ্ বুখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ অর্থই উদ্ধৃত করা হয়েছে। প্রকৃত-পক্ষে এ (انفال) শব্দটি সাধারণ, অসাধারণ—উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এতে কোন মতবিরোধ নেই। বস্তুত এর সর্বোত্তম ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা হল সেটাই, যা ইমাম আবূ ওবাইদ (র) করেছেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থ 'কিতাবুল আম্‌ওয়াল'-এ উল্লেখ করেছেন যে, মূল অভিধান অনুযায়ী 'নফল' বলা হয় দান ও পুরস্কারকে। আর এই উম্মতের প্রতি এটা এক বিশেষ দান যে, জিহাদ ও লড়াইয়ের মাধ্যমে যেসব মালসামান কাফির-দের কাছ থেকে লাভ করা হয়, সেগুলো মুসলমানদের জন্য হালাল করে দেওয়া হয়েছে। বিগত উম্মতের মধ্যে এই প্রচলন ছিল না। বরং গনীমতের মালের ক্ষেত্রে আইন ছিল এই যে, তা কারো জন্য হালাল ছিল না; সমস্ত গনীমতের মালামাল কোন এক জায়গায় জমা করা হত। অতপর আসমান থেকে এক অনল-বিদ্যুৎ এসে সেগুলোকে জ্বালিয়ে ছারখার করে দিত। আর এটাই ছিল আল্লাহ্ তা'আলার নিকট জিহাদ কবুল হওয়ার নিদর্শন। পক্ষান্তরে গনীমতের মালসামান একত্রিত করে রাখার পর যদি আকাশ থেকে বিদ্যুৎ এসে সেগুলোকে না জ্বালাত, তবে তা-ই ছিল জিহাদ কবুল না হওয়ার লক্ষণ। এতে বোঝা যেত, এ জিহাদ আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে গনীমতের সে মাল-সামানকেও প্রত্যাখ্যাত ও অলক্ষুণে মনে করা হত এবং সেগুলো কোন প্রকার ব্যবহারে আনা হতো না।

রসূলে করীম (সা) থেকে হযরত জাবের (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বুখারী ও মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে যে, হুযূরে আকরাম (সা) বলেছেন, আমাকে পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী উম্মতকে দেওয়া হয়নি। সে পাঁচটির একটি হল— احلت لى الغنائم ولم تحل لاحد قبلى অর্থাৎ আমার জন্য গনীমতের মালকে হালাল করা হয়েছে, অথচ আমার পূর্ববর্তী কারও জন্য তা হালাল ছিল না।

উল্লিখিত আয়াতে আনফাল-এর বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এগুলো আল্লাহ্‌র এবং রসূলের। তার অর্থ এই যে, এগুলোর প্রকৃত মালিকানা আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের এবং রসূলে করীম (সা) হচ্ছেন সেগুলোর ব্যবস্থাপক। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ মুতাবিক স্বীয় কল্যাণ বিবেচনায় সেগুলো বিলি-বন্টন করবেন।

সেজন্যই হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ইকরিমাহ্ (রা) এবং সুদ্দী (র) প্রমুখ তফসীরবিদের এক বিরাট দল মত প্রকাশ করেছেন যে, এই হুকুমটি

ছিল ইসলামের প্রাথমিক আমলের, যখন গনীমতের মালসামান বিলি-বন্টনের ব্যাপারে কোন আইন অবতীর্ণ হয়নি। আলোচ্য সূরার পঞ্চম রুকূতে এ বিষয়টিই আলোচিত হবে। এ আয়াতে গনীমতের যাবতীয় মালামালের বিষয়টি মহানবী (সা)-র কল্যাণ-বিবেচনার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি যেভাবে ইচ্ছা তার ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু পরবর্তীতে যে বিস্তারিত বিধি-বিধান এসেছে, তাতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, গনীমতের সম্পূর্ণ মালামালকে পাঁচ ভাগ করে তার এক ভাগ বায়তুলমালে সাধারণ মুসলমানদের প্রয়োজনের লক্ষ্যে সংরক্ষণ করতে হবে এবং বাকি চার ভাগ বিশেষ নিয়ম-নীতির ভিত্তিতে জিহাদে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদগণের মাঝে বন্টন করে দেওয়া হবে। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। সে সমস্ত বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সূরা আনফালের আলোচ্য প্রথম আয়াতটিকে রহিত করে দিয়েছে। আবার কোন কোন মনীষী বলেছেন যে, এখানে কোন 'নাসেখ-মনসূখ' অর্থাৎ রহিত কিংবা রহিতকারী নেই, বরং সংক্ষেপণ ও বিশ্লেষণের পার্থক্য মাত্র। সূরা আন্‌ফালের প্রথম আয়াতে যা সংক্ষেপে বলা হয়েছে, একত্রিশতম আয়াতে তারই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অবশ্য 'ফায়'-এর মালামাল---যার বিধান সূরা হাশরে বিবৃত হয়েছে, তা সম্পূর্ণভাবে রসূলে করীম (সা)-এর অধিকারভুক্ত। তিনি নিজের ইচ্ছা ও বিবেচনা অনুযায়ী যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারেন। সে কারণেই সেখানে তার বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا অর্থাৎ আমার রসূল যা কিছু তোমাদের দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে বারণ করেন, তা থেকে বিরত থাক।

এই বিশ্লেষণের দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, গনীমতের মাল হলো সে সমস্ত মালামাল, যা যুদ্ধ-জিহাদের মাধ্যমে হস্তগত করা হয়। আর 'ফায়' হল সে সমস্ত মালামাল যা কোন রকম লড়াই এবং জিহাদ ছাড়াই হাতে আসে। আর اَنْفَال (আন্‌ফাল) শব্দটি উভয় মালামালের জন্য সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয় এবং সেই বিশেষ পুরস্কার বা উপঢৌকনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যা জিহাদের নেতা বা পরিচালক দান করেন।

এ প্রসঙ্গে সাথীদেরকে পুরস্কার দেওয়ার চারটি রীতি মহানবী (সা)-র যুগ থেকে প্রচলিত রয়েছে। এক. একথা ঘোষণা করে দেওয়া যে, যে লোক কোন বিরোধী শত্রুকে হত্যা করতে পারবে---যে সামগ্রী তার সাথে থাকবে সেগুলো তারই হয়ে যাবে, যে হত্যা করেছে। এসব সামগ্রী গনীমতের সাধারণ মালামালের সাথে জমা হবে না। দুই. বড় কোন সৈন্যদল থেকে কোন দলকে পৃথক করে কোন বিশেষ দিকে জিহাদ করার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া এবং এমন নির্দেশ দিয়ে দেওয়া যে, এদিক থেকে যেসব গনীমতের মালামাল সংগৃহীত হবে সেগুলো উল্লিখিত বিশেষ দলের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে যারা সে অভিযানে অংশগ্রহণ করবে। তবে এতে শুধু এটুকু করতে হবে যে, সমস্ত মালামাল থেকে এক-পঞ্চমাংশ সাধারণ মুসলমানদের প্রয়োজনে বায়তুলমালে জমা করতে হবে। তিন. বায়তুল-মালে গনীমতের যে এক-পঞ্চমাংশ জমা করা হয়, তা থেকে কোন বিশেষ গাযী (জয়ী)-কে

তার কোন বিশেষ কৃতিত্বের প্রতিদান হিসাবে আমীরের কল্যাণ বিবেচনা অনুযায়ী কিছু দান করা। চার. সমগ্র গনীমতের মালামালের মধ্য থেকে কিছু অংশ পৃথক করে নিয়ে সেবাজীবী লোকদের মধ্যে পুরস্কারস্বরূপ দান করা, যারা মুজাহিদ বা সৈনিকদের ঘোড়া প্রভৃতির দেখাশোনা করে এবং তাদের বিভিন্ন কাজে সাহায্য করে। —(ইবনে কাসীর)

তাহলে আয়াতের মোটামুটি বিষয়বস্তু দাঁড়াল এই যে, এতে আল্লাহ্ তা'আলা রসূলে করীম (সা)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে, আপনার নিকট লোকেরা 'আন্‌ফাল' সম্পর্কে প্রশ্ন করে—আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, 'আনফাল' সবই হল আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের। অর্থাৎ নিজস্বভাবে কেউ এসবের অধিকারী কিংবা মালিক নয়। আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে তাঁর রসূল (সা) এগুলোর ব্যাপারে যে যে সিদ্ধান্ত নেবেন, তা-ই কার্যকর হবে।

মানুষের পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ঐক্যের ভিত্তি তাকওয়া বা পরহিযগারী এবং আল্লাহ্-ভীতি ঃ এ আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছে ঃ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

এতে সাহাবায়ে-কিরামকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং পারস্পরিক সম্পর্ককে ভাল রাখ। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে সেই ঘটনার প্রতি, যা বদর যুদ্ধে গনীমতের মালামালের বিলি-বন্টনসংক্রান্ত ব্যাপারে সাহাবায়ে-কিরামের মাঝে ঘটে গিয়েছিল। এতে পারস্পরিক তিক্ততা এবং অসন্তুষ্টি সৃষ্টির আশংকা বিদ্যমান ছিল। কাজেই আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন স্বয়ং গনীমতের মালামালের বিলি-বন্টনের বিষয় এ আয়াতের দ্বারা পরে মীমাংসা করে দিয়েছেন। তারপর তাঁদের অভ্যন্তরীণ সংস্কার ও পারস্পরিক সম্পর্ককে সুন্দর করার উপায় বলা হয়েছে যার কেন্দ্রবিন্দু হল তাকওয়া বা পরহিযগারী এবং আল্লাহ্‌ভীতি।

একথা অভিজ্ঞতার দ্বারা সপ্রমাণিত যে, যখন মানুষের মনে তাকওয়া, পরহিযগারী, আল্লাহ্ ও কিয়ামত আখিরাতের ভয়নীতি প্রবল থাকে, তখন বড় বড় বিবাদ বিসংবাদও মুহূর্তের মধ্যে নিষ্পত্তি হয়ে যায়। পারস্পরিক বিদ্বেষের পাহাড়ও ধূলার মত উড়ে যায়। মওলানা রূমীর ভাষায় পরহিযগারদের অবস্থা হয় এরূপ ঃ

خود چہ جائے جنگ وجدل نیک وبد
کیں الم از صلحہا سیرمد

অর্থাৎ "কোন রকম বিবাদ-বিসংবাদে তাদের সম্পর্ক কি থাকবে, তাদের কাছে যে মানুষের কল্যাণ ও সংস্কার সাধন করেই অবসর নেই।" কারণ, যে মন-মানস আল্লাহ্‌র

মহব্বত, ভয় এবং স্মরণে ব্যাকুল, তাদের পক্ষে অন্যের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার অবসরই বা কোথায়। সুতরাং

بسودای جاناں زجاں مشتغل
بذکر حبیب ازجہاں مشتغل

সে জনাই এ আয়াতে তাকওয়ার উপায় বাতলাতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ أَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ অর্থাৎ তাকওয়া ও পরহিযগারীর মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্কের সংশোধন কর। এরই কিছুটা বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে ঃ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ অর্থাৎ তোমরা যদি মু'মিনই হবে, তাহলে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পূর্ণ আনুগত্য কর। অর্থাৎ ঈমানের দাবিই হল আনুগত্য। আর আনুগত্যের ফল হল তাকওয়া। কাজেই মানুষ যখন এ বিষয়গুলো লাভ করতে সমর্থ হয়, তখন তাদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ, লড়াই-ঝগড়া আপনা থেকেই তিরোহিত হয়ে যায় এবং শত্রুতার স্থলে অন্তরে সৃষ্টি হয় প্রেম ও সৌহার্দ্য।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝٢ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝٣ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝٤

(২) যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহ্র নাম নেওয়া হয়, তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর। আর যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় কালাম, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় পরওয়ারদিগারের প্রতি ভরসা পোষণ করে। (৩) সে সমস্ত লোক যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে রুযী দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে—(৪) তারাই হল সত্যিকার ঈমানদার। তাদের জন্য রয়েছে স্বীয় পরওয়ারদিগারের নিকট মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক রুযী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(বস্তুত) ঈমানদার তো তারাই হয় যে, (তাদের সামনে) যখন আল্লাহ্‌র (বিষয়) আলোচনা করা হয়, তখন (তাঁর মহত্ত্বের উপস্থিতির দরুন) তাদের মন-প্রাণ ভীত (সন্ত্রস্ত) হয়ে ওঠে। আর যখন তাদের সামনে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন সে সমস্ত আয়াত তাদের ঈমানকে আরো বেশি (সুদৃঢ়) করে দেয় এবং তারা স্বীয় পরওয়ারদিগারের উপর নির্ভর করে। (আর) যারা নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রুযী-রোযগার দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে, তারাই হলো সত্যি-কার ঈমানদার। তাদের জন্য (নির্ধারিত) রয়েছে বিরাট বিরাট মর্যাদা তাদের পরওয়ার-দিগারের নিকট এবং (তাদের জন্য) রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রুযী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মু'মিনের বিশেষ গুণ-বৈশিষ্ট্য ঃ এ আয়াতগুলোতে সে সমস্ত গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে যা প্রতিটি মু'মিনের মধ্যে থাকা প্রয়োজন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রতিটি মু'মিন নিজের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থার পর্যালোচনা করে দেখবে, যদি তার মধ্যে এসব গুণ-বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করবে যে, তিনি তাকে মু'মিনের গুণাবলীতে মণ্ডিত করেছেন। আর যদি এগুলোর মধ্যে কোন একটি গুণ তার মধ্যে না থাকে, কিংবা থাকলেও তা একান্ত দুর্বল বলে মনে হয়, তাহলে তা অর্জন করার কিংবা তাকে সবল করে তোলার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করবে।

প্রথম বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্‌র ভয় ঃ আয়াতে প্রথম বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে ঃ اَلَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ অর্থাৎ তাদের সামনে যখন আল্লাহ্‌র আলোচনা করা হয়, তখন তাদের অন্তর আঁতকে ওঠে। অর্থাৎ তাদের অন্তর আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব ও প্রেমে ভরপুর, যার দাবি হল ভয় ও ভীতি। কোরআন করীমের অন্য এক আয়াতে তারই আলোচনাক্রমে আল্লাহ্-প্রেমিকদের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ অর্থাৎ (হে নবী,) সুসংবাদ দিয়ে দিন সে সমস্ত বিনয়ী, কোমলপ্রাণ লোকদের, যাদের অন্তর তখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, যখন তাদের সামনে আল্লাহ্‌র আলোচনা করা হয়। এতদুভয় আয়াতে আল্লাহ্‌র আলোচনা ও স্মরণের একটা বিশেষ অবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে; তা হল ভয় ও ত্রাস। আর অপর আয়াতটিতে আল্লাহ্‌র যিকিরের এই বৈশিষ্ট্যও বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাতে অন্তর প্রশান্ত হয়ে ওঠে। বলা হয়েছে ঃ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র যিকিরের দ্বারাই আত্মা শান্তি লাভ করে, প্রশান্ত হয়।

এতে বোঝা যাচ্ছে যে, আয়াতে যে ভয় ও ভীতির কথা বলা হয়েছে, তা মনের প্রশান্তি এবং স্বস্তির পরিপন্থী নয়, যেমন হিংস্র জীব জন্তু কিংবা শত্রুর ভয় মানুষের মনের শান্তিকে ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহ্‌র যিকিরের দরুন অন্তরে সৃষ্ট ভয় তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সেজন্য এখানে خَوْفٌ শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। وَجَلٌ শব্দের দ্বারা বোঝানো হয়েছে। এর অর্থ সাধারণ ভয় নয়; বরং এমন ভয়, যা বড়দের মহত্ত্বের কারণে মনের মধ্যে সৃষ্টি হয়। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন যে, এখানে আল্লাহ্‌র যিকির বা স্মরণ অর্থ হচ্ছে, কোন ব্যক্তি কোন পাপ কাজে লিপ্ত হতে ইচ্ছা করছিল, তখনই আল্লাহ্‌র কথা তার স্মরণ হয়ে গেল এবং তাতে সে আল্লাহ্‌র আযাবের ভয়ে ভীত হয়ে গেল এবং সে পাপ থেকে বিরত রইল। এ ক্ষেত্রে ভয় অর্থ হবে আযাবের ভয়।---(বাহরে মুহীত)

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ঈমানের উন্নতি ঃ মু'মিনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তার সামনে যখন আল্লাহ্‌ তা'আলার আয়াত পাঠ করা হয়, তখন তার ঈমান বৃদ্ধি পায়। সমস্ত আলিম, তফসীরবিদ ও হাদীসবিদদের সর্বসম্মত মতে ঈমান বৃদ্ধির অর্থ হলো ঈমানের শক্তি, অবস্থা এবং ঈমানী জ্যোতির উন্নতি। আর একথা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রমাণিত যে, সৎ কাজের দ্বারা ঈমানী শক্তি এবং এমন আত্মিক প্রশান্তি সৃষ্টি হয়, তাতে সৎকর্ম মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। তখন তা পরিহার করতে গেলে খুবই কষ্ট হয় এবং পাপের প্রতি একটা প্রকৃতিগত ঘৃণার উদ্ভব হয়, যার ফলে সে তার কাছেও যেতে পারে না। ঈমানের এ অবস্থাকেই হাদীসে 'ঈমানের মাধুর্য' শব্দে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কোন এক কবি ছান্দিক ভাষায় এভাবে বলেছেন ঃ

وإذا حلت الحلاوة قلبا - نشطت فى العبادة الاعضاء

অর্থাৎ অন্তরে যখন ঈমানের মাধুর্য বদ্ধমূল হয়ে যায়, তখন হাত-পা এবং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহ্‌র ইবাদতের মাঝে আনন্দ ও শান্তি অনুভব করতে আরম্ভ করে।

সুতরাং আয়াতের সারমর্ম হচ্ছে এই যে, একজন পরিপূর্ণ মু'মিনের এমন গুণ-বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত যে, তার সামনে যখনই আল্লাহ্‌র আয়াত পাঠ করা হবে, তখন তার ঈমানের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাবে, তাতে উন্নতি সাধিত হবে এবং সৎকর্মের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পাবে। এতে বোঝা যাচ্ছে, সাধারণ মুসলমানেরা যেভাবে কোরআন পাঠ করে এবং শোনে, যাতে না থাকে কোরআনের আদব ও মর্যাদাবোধের কোন খেয়াল, না থাকে আল্লাহ্‌ জাল্লাশানুহুর মহত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য, সে ধরনের তিলাওয়াত উদ্দেশ্যও নয় এবং এতে উচ্চতর ফলাফলও সৃষ্টি হয় না। অবশ্য সেটাও সম্পূর্ণভাবে পুণ্য বিবর্জিত নয়।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা ঃ মু'মিনের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্‌ তা'আলার উপর ভরসা করবে। তাওয়াক্কুল অর্থ হল আস্থা ও ভরসা। অর্থাৎ, নিজের যাবতীয় কাজ-কর্ম ও অবস্থায় তার পরিপূর্ণ আস্থা ও

ভরসা থাকে শুধুমাত্র একক সত্তা আল্লাহ্ তা'আলার উপর। সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, এর অর্থ এই নয় যে, স্বীয় প্রয়োজনের জন্য জড়-উপকরণ এবং চেষ্টা-চরিত্রকে পরিত্যাগ করে বসে থাকবে। বরং এর অর্থ হলো এই যে, বাহ্যিক জড়-উপকরণকেই প্রকৃত কৃতকার্যতার জন্য যথেষ্ট বলে মনে না করে; বরং নিজের সামর্থ্য ও সাহস অনুযায়ী জড়-উপকরণের আয়োজন ও চেষ্টা-চরিত্রের পর সাফল্য আল্লাহ্ তা'আলার উপর ছেড়ে দেবে এবং মনে করবে যে, যাবতীয় উপকরণও তাঁরই সৃষ্টি এবং সে উপকরণসমূহের ফলাফলও তিনিই সৃষ্টি করেন। বস্তুত হবেও তাই, যা তিনি চাইবেন। এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ اجملوا فى الطلب وتوكلوا عليه অর্থাৎ স্বীয় যিকির এবং অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য মাঝামাঝি পর্যায়ের অন্বেষণ এবং জড়-উর্করণের মাধ্যমে চেষ্টা করার পর তা আল্লাহ্র উপর ছেড়ে দাও। নিজের মন-মস্তিষ্ককে শুধুমাত্র স্থূল প্রচেষ্টা ও জড়-উপকরণের মাঝেই জড়িয়ে রেখো না।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য নামায প্রতিষ্ঠা করা ঃ মু'মিনের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে নামায প্রতিষ্ঠা করা। এখানে এ বিষয়টি স্মরণ রাখার যোগ্য যে, এখানে 'নামায' পড়ার কথা নয়; বরং নামায প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে। اقامت শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো কোন কিছুকে সোজা দাঁড় করানো। কাজেই اقامت صلوٰة—এর মর্মার্থ হচ্ছে নামাযের যাবতীয় আদব-কায়দা, রীতিনীতি ও শর্তাশর্ত এমনভাবে সম্পাদন করা, যেমন করে রসূলে করীম (সা) স্বীয় কথা ও কাজের মাধ্যমে বাতলে দিয়েছেন। আদব-কায়দা ও শর্তাশর্তের কোন রকম ত্রুটি হলে তাকে নামায পড়া বলা গেলেও নামায প্রতিষ্ঠা করা বলা যেতে পারে না। কোরআন মজীদে নামাযের যেসব উপকারিতা, প্রভাব-প্রতিক্রিয়া এবং বরকতের কথা বলা হয়েছে—যেমন, إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (অর্থাৎ নামায লজ্জাহীনতা ও পাপ থেকে বিরত রাখে) তা এই নামায প্রতিষ্ঠা করার উপরই নির্ভরশীল। নামাযের আদবসমূহে যখন কোন রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে, তখন ফতোয়ার দিক দিয়ে তার সে নামাযকে জায়েয বলা হলেও ত্রুটির পরিমাণ হিসাবে নামাযের বরকত ও কল্যাণে পার্থক্য দেখা দেবে। কোন কোন অবস্থায় তার বরকত বা কল্যাণ থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হতে হবে।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্র রাহে ব্যয় করা ঃ মর্দে-মু'মিনের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাকে যে রিযিক দান করেছেন, তা থেকে আল্লাহ্র রাহে খরচ করবে। আল্লাহ্র রাহে এই ব্যয় করার অর্থ ব্যাপক। এতে শরীয়ত নির্ধারিত যাকাত-ফিতরা প্রভৃতি, নফল দান-খয়রাতসহ মেহমানদারী, বড়দের কিংবা বন্ধুবান্ধবদের প্রতি কৃত আর্থিক সাহায্য-সহায়তা প্রভৃতি সব রকমের দান-খয়রাতই অন্তর্ভুক্ত।